
বাঙলা
সনেট

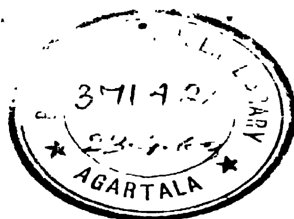


॥ বাঙলা সনেটের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সশ্রদ্ধ নিবেদন ॥

বাঙলা সনেট

জীবেন্দ্র সিংহরায় ও শক্তিব্রত ঘোষ

সম্পাদিত



কথাশিল্প

১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২



প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ ১৩৬৩

প্রকাশক :
নীহাররঞ্জন রায়
কথাশিল্প
১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট । কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট । কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
খালেদ চৌধুরী

পাঁচ টাকা

শ্রদ্ধেয়

হরপ্রসাদ মিত্র

করকমলেষু

মুখবন্ধ

সনেট ছোট কবিতা, কিন্তু উজ্জ্বল কবিকৃতি। দীর্ঘ গীতি-কবিতায় যে ভাবের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ, চতুর্দশপদীর সংযত ও সংহত রূপের মধ্যে তাকে ফুটিয়ে তোলা সহজ নয়। তার জন্য চাই কবির গভীর রসচেতনা, আত্মস্থ ব্যক্তিত্বের পরিমিতিবোধ ও ভাস্করসুলভ শিল্পদক্ষতা। ঢিলে-ঢালা আবেগ ও চিন্তার শৈথিল্য নিয়ে সনেটের নিরেট প্রতিমা গড়ে উঠতে পারে না। চোদ্দ চরণের আঁটসাঁট শক্ত-সমর্থ কায়ার মধ্যে ভাবের নিটোল মুক্তো-রূপটি কখনোই ফুটে ওঠে না, যদি না তার পেছনে থাকে কবির সযত্ন সাধনকলা। অথচ আর্টের গুণে সনেটের স্বল্পায়তন দেহডৌলও পাঠকের সৌন্দর্যতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করে, এক একটা বড়ো কবিতার মতোই মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। এতে সৃজনশীলতার একটা কঠিন পরীক্ষা হয়, সন্দেহ নেই ; তবু অনেক কবি সনেটের মধ্যে সন্ধান পান আপন শিল্পী-মানসের মুক্তির পথ—

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন।

—প্রমথ চৌধুরী

এ যেন মুকুরতলে ব্রহ্মাণ্ডের ছায়া,
অসীমেরে টেনে আনা সীমার মাঝারে,

—প্রিয়ম্বদা দেবী

অনিত্যের স্মৃতি-চিহ্ন—হোক এতটুক—
নিত্যের গবাক্ষে জ্বলে ; অতি ক্ষুদ্র দান
ক্ষুদ্র দীপ, আঁধারের তবু অভিজ্ঞান,—
মুখে তার রক্তরাগ, স্নেহে সিক্ত বুক,—

—সুশীলকুমার দে

সুতরাং কবিকর্ম হিসেবে সনেটের মর্যাদা অনেক। তার রূপসাধনা ও ভাবসাধনা প্রতিভাসাধ্য। অথচ কেউ কেউ মনে করেন, এ যেন কানাকড়ি নিয়ে খেলা। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, খেলতে জানলে কানাকড়ি নিয়েও খেলা যায়, তাতেও জয় প্রতিশ্রুত। এর প্রমাণ পাই ইতালীয় সাহিত্যে। সেখানে শুধু সনেটের জন্ম হয়নি, হয়েছে তার চরম বিকাশ। তাই একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন—'Whoever finds sonnets unattractive or repulsive to him is out of tune with the whole genius of Italian poetry.'। ইতালীয় সনেটের মতো ইংরেজী সনেট সর্বজনস্বীকৃতি না পেলেও শেক্সপীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, রসেটি ইত্যাদি অনেক কবির কয়েক শতাব্দীব্যাপী চর্চার ফলে তার মূল্য সসম্মানে স্বীকৃত। ফরাসী সাহিত্যেও সনেটের একটি উজ্জ্বল ছাঁচের সুন্দর বিকাশ দেখতে পাই। অতএব স্বীকার করতেই হবে, চতুর্দশপদী কবিতা অক্ষম প্রতিভার অকিঞ্চিৎকর সৃষ্টি নয়, ভাবের অভাব বা অবক্ষয় থেকেও তার জন্ম হয় না। বরং প্রেরণা-গভীর কবিত্বের বহ্নিবিলাসের দিনেই যেন সনেটের ছোট্ট দীপটি সবচেয়ে বেশি দীপ্তিমান হয়ে ওঠে।

সব কবিই সনেট লিখতে পারেন না। চট্টলের কবি নবীন সেন বা বাংলা কাব্যের ভোরের পাখি বিহারীলাল চেষ্টা করলে চোদ্দ চরণের কবিতা রচনা করতে পারতেন নিশ্চয়, তবে সনেট রচনা করতে পারতেন বলে মনে হয় না। শেলীর মতো আবেগধর্মী কবির পক্ষে ভালো সনেট-স্রষ্টা হওয়া সম্ভব ছিলো কি? অন্ততঃ প্রমথ চৌধুরী তা মনে করতেন না, কারণ শেলী পড়লে তাঁর বুকে জ্বালা ধরতো। এ থেকেই বোঝা যায়, খাঁটি সনেট রচনার জন্য মনের একটা বিশেষ গড়ন চাই। মোহিতলাল বলেছেন, যতদিন না খাঁটি গীতি-কবিতার অভ্যুদয় হয় ততদিন সনেটচর্চা সার্থকতা লাভ করতে পারে না। অর্থাৎ লিরিক-প্রেরণাই হচ্ছে সনেটের মূল প্রেরণা, ভাবাবেগের প্রবলতাই সনেটের মর্মমূলে রস-সঞ্চার করে থাকে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মত একটু পৃথক। ভাবাবেগের প্রবলতা বা উচ্ছ্বসিত লিরিক-প্রেরণাকে একটা

চোদ্দ চরণের ক্ষোদিত মূর্তির মধ্যে রূপ দেওয়া কি সহজ? এ যেন দুটো স্ব-বিরোধী শক্তিকে একসূত্রে গ্রথিত করার কঠিন পরীক্ষা। সনেটের কলাকীর্তি রচনা আয়াসসাধ্য সন্দেহ নেই, তবু বহির্মুখী লিরিক-উচ্ছ্বাসকে একটা নির্দিষ্ট রূপবৃত্তের বন্ধনে বন্দী করার প্রত্যাশা একটু অতিরিক্ত বলেই মনে হয়। সনেটে লিরিক-কল্পনার প্রকাশ স্বীকার করি বটে, কিন্তু সেই লিরিক-কল্পনার গতি যদি হয় বাধাবন্ধহীন প্রসারের দিকে তবে তা নিয়ে সনেট রচনার চেষ্টা দুঃসাহসের কথা। আসল কথা, যে লিরিক-কল্পনার প্রবণতা স্বভাবতঃই ভেতরের দিকে—সঙ্কোচনের দিকে—ঘনতার দিকে, তা-ই সনেটের যথার্থ উপজীব্য। একটা তুলনা দিয়ে কথাটা বোঝাতে চাই। এমন অনেক তরল পদার্থ আছে, হাওয়ায় রাখলে যা ক্রমশঃ ঘন হয় এবং ঘন হয়ে আয়তনে ছোট হয়। তেমনি অনেকখানি ভাব সংহত হয়ে একটুখানি ভাবনা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা যেখানে থাকে, সেখানেই সনেটের সুনিয়মিত ছাঁচে তার রূপায়ণ হতে পারে। অন্য ভাবে বলা যায়, সনেটকারের লিরিক্যাল মানসে উচ্ছ্বাসধর্মিতা প্রবল হলে কোন পূর্ব-নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তাকে শাসন করে রাখা যায় না। তাই সনেটের ক্ষেত্রে কবির লিরিক প্রেরণার ঝোঁকটা থাকে সংহতি ও আত্মস্থতার দিকে। সনেটের লিরিক-কল্পনায় এই ক্লাসিক্যাল ঝোঁক আছে বলেই তাকে একটা বিশেষ গঠনে বা ছাঁচে ফেলে, একটা নির্দিষ্ট নাগপাশে সুঠাম ও সুডৌল রূপাবয়ব দেওয়া সম্ভব। ভাব ও রূপের এই নিগূঢ় ছন্দে ও সামঞ্জস্যেই সনেটের প্রাণ-প্রতিমার সৃষ্টি।

সনেটে কবির লিরিক-প্রেরণার ঝোঁক যে ক্লাসিক্যাল সংহতির দিকে হওয়া চাই, তা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দুটো কবিতার তুলনামূলক বিচার করে প্রমাণ করা যায়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে 'To the cuckoo' নামে একটি কবিতা তিনি রচনা করেন। তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ। কবিতাটিতে তাঁর আবেগ ও উচ্ছ্বাস চল্লিশটি চরণের ছন্দে ছন্দে বেজে উঠেছে, একটা পুলকের শিহরণ কবিতাটির সমস্ত কথা-শরীরের মধ্যে অনুভব করা যায়।

O Blithe New-comer ! I have heard,
I hear thee and rejoice.
O Cuckoo ! Shall I call thee Bird.
Or but a wandering Voice ?

While I am lying on the grass
Thy twofold shout I hear,
From hill to hill it seems to pass,
At once far off, and near.

Though babbling only to the vale,
Of sunshine and of flowers,
Thou bringest unto me a tale
Of visionary hours.

Thrice welcome, darling of the Spring !

Even yet thou art to me
No bird, but an invisible thing,
A voice, a mystery ;

ইত্যাদি

এই সুপরিচিত ও সুন্দর লিরিকটি রচনার বছরেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর মূল ইতালীয় ভাষা থেকে একটি সনেট অনুবাদ করেন ('To The Supreme Being')। কিন্তু সনেটের সেই অনুবাদ তাঁর কাছে সহজসাধ্য মনে হয়নি—'he even attempted fifteen of the sonnets of Michael-angelo, but so much meaning is compressed into so little room in those pieces that he found the difficulty insurmountable'.। এ থেকেই সিদ্ধান্ত করতে হয়, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মনটা তখন ভাস্কর্যধর্মী সনেট রচনার অনুকূল ছিলো না (যদিও ১৮০১ সালে সনেট রচনায় তাঁর হাতেখড়ি হয়), বরং উচ্ছ্বসিত আবেগে লিরিক লেখা তাঁর পক্ষে ছিলো স্বাভাবিক। তাই তিনি একটি বনবিহঙ্গকে নিয়ে সনেট রচনা

করতে চান নি, বরং ভাবের রসানুকূল শব্দে ও ছন্দে একটি সুন্দর লিরিক লিখেছেন। তারপর ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে সাতান্ন বছর বয়সে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সেই একই বনবিহঙ্গকে নিয়ে একটি সনেট রচনা করেন—

Not the whole warbling grove in concert heard
When sunshine follows shower, the breast can thrill
Like the first summons, Cuckoo! of thy bill,
With its twin notes inseparably paired.
The captive 'mid damp vaults unsunned, unaired,
Measuring the periods of his lonely doom,
That cry can reach; and to the sick man's room
Sends gladness, by no languid smile declared.
The lordly eagle-race through hostile search
May perish; time may come when never more
The wilderness shall hear the lion roar;
But, long as cock shall crow from house-hold perch
To rouse the dawn, soft gales shall speed thy wing,
And thy erratic voice be faithful to the Spring!

—To the Cuckoo.

পূর্বোক্ত লিরিকটির তুলনায় এ সনেটটি অনেক বেশি গম্ভীর। এতে প্রসন্ন কবিত্বের অভাব ঘটেছে বলে একটু আপাত-গাম্ভীর্যের ভাব যেমন দেখা দিয়েছে, তেমনি সনেটের রূপকল্পের দাবি অনুযায়ী ভাব ও ভাষার সন্নিবেশের জন্যও একটা সংযম-সুন্দর কাব্যাভিব্যক্তি ঘটেছে। লিরিকে যেখানে কোকিলের কুহুধ্বনিতে কবির উল্লাস কয়েকটি স্তবক জুড়ে ঘুরে ঘুরে কথা কয়েছে, সেখানে সনেটটিতে কুহুধ্বনির মোহময়তার কথা বেজে উঠেছে মাত্র পাঁচটি চরণে—তাতেও কবির ব্যক্তিগত আনন্দের চরণধ্বনি নেই, আছে একটা সাধারণ আনন্দসংবাদ মাত্র। সনেটটির শেষ ছয় চরণে কবির মনোভাবও ('একদিন অরণ্য থেকে হয়তো সিংহের গর্জন নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু যতদিন ঘরে ঘরে মোরগ-ডাকা উষা দেখা দেবে, ততদিন বসন্তপ্রিয়ার কুহুধ্বনির বিরাম ঘটবে না')

লিরিকটিতে ছিলো না ; কিন্তু অষ্টকের বক্তব্যকে ষট্‌কের মধ্যে পরিণতি দিতে গিয়ে এই ধরনের একটা সিদ্ধান্ত সনেটের পক্ষে ছিলো অপরিহার্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, লিরিকটিতে ভাবের যে তোড় ছিলো সনেটটিতে তা অনুপস্থিত ; সেই ভাবগত উদ্দাম প্রবাহের বদলে একটা ক্রম-বিন্যস্ত সংযত ভাব চতুর্দশ-পদীটিতে দীপ্তিমান। ভাষা ও ছন্দের পার্থক্যও লক্ষণীয় ; যেখানে সহজ সরল শব্দের আনাচে কানাচে ছোট ছোট বাক্যের খাতে খাতে লিরিকটির ভাব উচ্ছ্বসিত, সেখানে দীর্ঘায়ত চরণে অপেক্ষাকৃত কঠিন শব্দের শৃঙ্খলে, এমন কি তুলনামূলক চিত্রকল্পে সনেটটির ভাব স্ফূর্তি পেয়েছে। চতুর্দশপদীটিতে মিল্টনের সনেটের ক্লাসিক্যাল ঝোঁকের প্রভাব আছে বলে মনে হয় (মিল্টনের সনেট শুনে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সনেট রচনা করতে অনুপ্রাণিত হন, তাঁর নিজের এই স্বীকারোক্তি এখানে স্মর্তব্য)। আসল কথা, লিরিকের মনোভাব নিয়ে তিনি সনেট রচনা করেন নি ; তাঁতে একটা আলাদা মন ও মেজাজের সাক্ষাৎ পাই।

সনেট যে জাতীয়ই হোক না কেন, তার সংযম-সুন্দর ভাবরূপটি আমাদের মনোহরণ করে। রীতিভেদে রসাভিব্যক্তির তারতম্য ঘটতে পারে, কবি-স্বভাব অনুযায়ী ভাবের প্রকাশ কম-বেশি স্থূল-সূক্ষ্মও হতে পারে ; কিন্তু কোন অবস্থাতেই শৈথিল্যের প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়, পরিমিত কথায় গভীর ভাব-প্রকাশের দাবি থেকে নিস্তার নেই। বোধ হয়, শৈথিল্যের সম্ভাবনা পরিহার ও সংযমের বন্ধন দৃঢ় করার জন্যই সনেটকারগণ এমন দৈর্ঘ্যের কবিতা রচনা করেন, যা ভাবপ্রবাহিণী গীতিকবিতার মতো অনির্দিষ্টপরিসর না হয়। অন্যদিকে ভাবের দীপ্তি ও স্ফূর্তি, স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল প্রকাশ অভীপ্সিত বলেই তাঁরা চুটকির মতো অস্বচ্ছ স্বল্পায়তন কবিতাও রচনা করেন না। এই দু'দিক থেকেই চোদ্দ চরণ উপযুক্ত বলে বিবেচিত।

তবে শুধু ভাবের সংযম-সৌন্দর্যে সনেটের কলাকীর্তি মহিমা লাভ করে না, একটা কঠিন গঠনের মধ্যে একটা বন্ধনের পীড়নেই তার ভাব স্ফূর্তি, দীপ্তি ও গতি পায়। তাই সনেটের সার্থকতার বিচারে রূপবন্ধের কথাটা বিশেষ

গুরুত্বপুর্ণ। যদিও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো সনেটের টেকনিকটাকে আসল মনে করা এবং ভাবকে সেই টেকনিকের কাঠামোর ওপর মাটির প্রলেপ ও সৌন্দর্যের রঙ-লেপনের নামান্তর বলে ধরে নেওয়া বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়, তবু অবশ্য স্বীকার করে নিতে হয় যে, টেকনিকের যাথার্থ্যের ওপরই সনেটের সিদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে। যেখানে ভাব-প্রাণের সঙ্গে কথা-শরীরের অঙ্গাঙ্গি মিলন ঘটে—যে মিলন হরগৌরীর মিলনের উপমা—সেখানে কবির সার্থকতা প্রশ্নাতীত। কথা উঠতে পারে, ভালো কবিতা মাত্রেই তো ভাব ও রূপের সুন্দর সামঞ্জস্য দেখা যায় এবং সে-কারণেই সনেটের ক্ষেত্রে এ-মন্তব্যের বিশেষ তাৎপর্য কোথায়? অন্যান্য ক্ষেত্রে কবির ভাবের টানে রূপের প্রকাশ। কবির প্রকৃতিভেদে হয়তো ভাবচেতনার সঙ্গে সঙ্গে রূপসাধনার কথাটাও থাকে তাঁর সজ্ঞান অভিপ্রায়ের মধ্যে, তবু তাঁর সাধনক্রিয়ার মূলসূত্র ভাবের সঙ্গেই যুক্ত। কিন্তু সনেটে রূপের প্রসাধন কবি-প্রযত্নের প্রধান কথা, ভাব সেখানে 'পতিগতপ্রাণা সতীর মতো' রূপের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে এবং অঙ্গে অঙ্গে মিলন খোঁজে। সুতরাং সনেটের রূপ ও রীতির ক্ষেত্রেও কবিদের হয় এক কঠিন পরীক্ষা।

সনেটের জন্ম ইতালীতে, যদিও তার প্রথম যুগ স্পষ্ট নয়। তবে পেত্রার্কের কলমেই সনেট প্রথম বিশিষ্ট ও পরিচ্ছন্ন রূপ লাভ করে এবং এক বিশিষ্ট পদ্ধতির সনেটের জনয়িতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করায় পেত্রার্ক ও সনেট পরস্পর আপেক্ষিক (correlative) শব্দ হয়ে ওঠে। পেত্রার্কীয় সনেটের যে আদলটি আন্তর্জাতিক আদর্শ রূপে সুপরিচিত, তার চোদ্দ চরণের মধ্যে দুটি ভাগ থাকে —প্রথম আট চরণ নিয়ে অষ্টক (octave) ও শেষ ছয় চরণ নিয়ে ষট্‌ক (sestet)। অষ্টকের মিলের পদ্ধতি হচ্ছে—কখখক, কখখক এবং ষট্‌কের —চছ চছ চছ বা চছজ চছজ ইত্যাদি। এই জাতীয় সনেটের অষ্টক ও ষট্‌ক বিভাগ কবির খেয়ালপ্রসূত নয়। ওয়াট্‌স্ ডান্‌টনের মতে, সাগরতরঙ্গ যেমন স্ফীত হয়ে বেলাভূমির ওপর পড়ে এবং নিমেষমাত্র স্থির থেকে আবার সাগরগর্ভে বিলীন হয়ে যায়, তেমনি ভাবের তরঙ্গ অষ্টকের শব্দে ছন্দে উচ্ছলিত

হয়ে ওঠে এবং চকিত যতির শেষে নিমেষমাত্র স্থির থেকে ষট্‌কের বিপরীত আবর্তনে শেষ হয়ে যায়। সহজ কথায়, অষ্টকে মূল ভাব বা বিষয়টি উপস্থিত করা হয় এবং ষট্‌কে থাকে তার ব্যাখ্যা বা বিস্তৃতি বা উপসংহার। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—

Lady that in the prime of earliest youth, ক
Wisely hast shun'd the broad way and the green খ
And with those few art eminently seen, খ
That labour up the Hill of heav'nly Truth, ক
The better part with Mary and with Ruth, ক
Chosen thou hast, and they that overween, খ
And at thy growing vertues fret their spleen খ
No anger find in thee, but pity and ruth. ক

Thy care is fixt and zealously attends চ
To fill thy odorous Lamp with deeds of light, ছ
And Hope that reaps not shame. Therefore be sure জ
Thou, when the Bridegroom with his feastfull friends চ
Passes to bliss at the mid hour of night, ছ
Has gain'd thy entrance, Virgin wise and pure. জ

—Milton

ওয়াট ও সারে ইংল্যাণ্ডে প্রথম সনেট প্রবর্তন করেন এবং ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সেখানে সনেট বেশ পরিচিত হয়ে যায়। তবে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে সেক্সপীয়ারের সনেট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট ইংরেজী সনেটের চরম বিকাশ দেখা যায়। সেক্সপীয়ার পেত্রার্কীয় সনেটের আদর্শ অনুসরণ করেন নি। তাঁর সনেটের চোদ্দ চরণ তিনটি চৌপদী (quatrain) ও একটি সমিল দ্বিপদীতে (couplet) বিভক্ত। তাঁর রীতি হচ্ছে, প্রত্যেকটি চৌপদীতে একান্তর (alternate) ও ভিন্নতর (different) মিল থাকবে। অর্থাৎ কখকখ, গঘগঘ, পফপফ, চচ। সেক্সপীয়ারের সনেটে অষ্টক ও ষট্‌ক

বিভাগের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই—যদিও তাঁর কোন কোন সনেটে অষ্টম চরণের শেষে ভাবের বিরাম দেখা যায়। তবে সেক্সপীয়ারের সনেটের শেষ দুই চরণে কখনও পূর্ববর্তী বারোটি চরণের ভাব ও রসের সমষ্টিগত অথচ সংক্ষিপ্ত প্রকাশ ঘটে, কখনও বা বিপরীত ভাবের অভিব্যক্তিতে একটা বৈসাদৃশ্যজনিত উজ্জ্বলতা (epigrammatic effect) সৃষ্টি হয়। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে—

Two loves I have of comfort and despair, ক
Which like two spirits do suggest me still · খ
The better angel is a man right fair• ক
The worser spirit a woman, colour'd ill. খ

To win me soon to hell, my female evil গ
Tempteth my better angel from my side, ঘ
And would corrupt my saint to be a devil, গ
Wooing his purity with her foul pride. ঘ

And whether that my angel be turn'd fiend, প
Suspect I may, yet not directly tell ; ফ
But being both from me, both to each friend, প
I guess one angel in another's hell. ফ

Yet this shall I ne'er know, but live in doubt, চ
Till my bad angel fire my good one out. চ

—Shakespeare.

এখানে মিলের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতির কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তারই অনুবর্তন আছে। তিনটি চৌপদীতে যে বন্ধু মানুষ ও উপেক্ষিকা নারীর কথা বলা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত আছে শেষ দুই চরণে। সেই সিদ্ধান্ত পূর্ববর্তী বারোটি চরণের সমষ্টিগত বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত পরিণতি মাত্র। অষ্টম চরণের শেষে ভাবের বিরাম ও নবম চরণ থেকে ভাবের নতুন মোড়ও লক্ষণীয়।

সনেট রচনার এই সেক্সপীরীয় রীতিতে একটা স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা আছে, সন্দেহ নেই।

ফরাসী দেশেও সনেটের চর্চা বহুকাল ধরে চলে আসছে এবং কালক্রমে সনেটের একটা ফরাসী রীতিও গড়ে উঠেছে। এই রীতির সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে পেত্রার্কীয় সনেটের মতো দ্বিধা বিভাগ নেই, আছে ত্রিধা বিভাগ। ষট্‌কের প্রথম দুই চরণে পরস্পর পয়ার-মিলের পর আবার শেষ চারটি চরণে আদি সনেট-রীতির অনুসরণ দেখা যায়। অর্থাৎ কখখক কখখক, গগ, চছচছ। নবম ও দশম চরণের আঁটসাঁট পয়ার-মিল সনেটের প্রতিমার মধ্যভাগে একটা গঠনগত ঔজ্জ্বল্য আনে। ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সনেটকার Joachim du Bellay ত্রিধাবিভক্ত সনেট রচনা করেছিলেন আয়রনি ও স্যাটায়ার প্রকাশের জন্য। সে যাই হোক, এই যে ফরাসী সনেটের অভিনব রূপমূর্তি—তাতে সেক্সপীরীয় সনেটের প্রোজ্জ্বল পয়ারপুচ্ছ নেই, নেই পেত্রার্কীয় সনেটের দ্বিধাসুন্দর দেহডৌল, কিন্তু যা আছে সেই কটিদেশের খড়্গাবন্ধ আর চোদ্দ চরণের ত্রিভঙ্গঠাম পাঠকের রসবোধকে তৃপ্ত করে। যেমন— ৬

Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, ক
Assise auprès du feu, dévidant et filant, খ
Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant : খ
Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. ক

Lors vous n'aurez servante oyant telle nouvelle ; ক
Déjà sous le labeur à demi sommeillant, খ
Qui au bruit de mon nom ne s'en aille réveillant, খ
Bénissant votre nom de louange immortelle, ক

Je serai sous la terre, et fantome sans os গ
Par les ombres myrteux je prendrai mon repos গ

Vous serez au foyer une vieille accroupie, চ
Regrettant mon amour et votre fier dédain ছ

Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain ছ ১
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. চ

—pour Hélène, Ronsard.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সনেটের তিনটি রীতি সমধিক প্রসিদ্ধ—পেত্রার্কীয়, সেক্সপীরীয় ও ফরাসী। এই তিনটি রীতির বিশ্বস্ত অনুসরণ যেমন নানা দেশের কবিতায় পাওয়া যায়, তেমনি একাধিক রীতির সংমিশ্রণে সনেটের বৈচিত্র্য সম্পাদনের চেষ্টাও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। পেত্রার্কীয় আদের্শর সনেটের শেষে সেক্সপীরীয় পয়ারপুচ্ছ জুড়ে দিতে কেউ কেউ যেমন দ্বিধা করেন নি, তেমনি সেক্সপীরীয় সনেটের অন্তিম চরণদ্বয়ে পেত্রার্কীয় মিলের অবতারণা করার চেষ্টাও কবিরা করেছেন। এক রীতির সনেটে অন্য রীতির মিল, সেক্সপীরীয় সনেটে ভাবের আবর্তন-নিবর্তন, পেত্রার্কীয় সনেটের দ্বিধা-বিভাগ বর্জন ইত্যাদি নানা প্রকারের মৌলিকতা দেখানোর বিচিত্র প্রয়াসও অনুপস্থিত নয়। কিন্তু এই সব পরীক্ষামূলক নূতনত্ব সত্ত্বেও ভালো সনেটে ভাব ও রূপের পারস্পরিক সহযোগিতায় এক একটি দৃঢ়পিনদ্ধ ও ভাস্কর্যধর্মী কবিতা গড়ে ওঠে। কিন্তু যেখানে নূতনত্বের অর্থ অরাজকতা, বৈচিত্র্য আসলে শৈথিল্যেরই নামান্তর মাত্র, সেখানে তথাকথিত সনেটের প্রশংসা করা যায় না।

সনেটে নির্দিষ্ট মিলের পরিকল্পনার পশ্চাতে একটি যুক্তি থাকে। তা নিতান্তই কবিদের খেয়ালী পরিকল্পনা নয়। এক এক জাতীয় সনেটে এক এক রসরূপের স্বপ্ন-সাধনা থাকে বলে তাদের মিলের পদ্ধতিও হয় ভিন্ন ভিন্ন। ছন্দ-ধ্বনি যাতে ভাবের গভীর ও গম্ভীর ধ্বনিকে ছাপিয়ে না ওঠে, এককেন্দ্রিক ভাবসূত্রকে বিক্ষিপ্ত করে তার সুঠাম সুন্দর অবয়ব নষ্ট করে না দেয়, সেজন্যই একটি সুনিয়মিত মিলের পদ্ধতি সনেটে অনুসরণ করা হয়। শুধু তাই নয়, বহুবিচিত্র মিল বা একই ধরনের মিলও বিশেষ ছন্দ-সঙ্গীতের অনুকূল নয় বলে বর্জনীয়। অন্যদিকে মিলের অসামঞ্জস্য বা নামমাত্র মিল ভাবকে ঘনীভূত করতে সাহায্য করে না বলেই সনেটের পক্ষে অনুপযুক্ত। আরেকটি কথা। অনেকের মতে যুক্ত ব্যঞ্জনমূলক মিল বা feminine rhyme কবির অক্ষমতারই পরিচায়ক,

প্রতিভার নয়। সনেটে যে ছন্দ-ধ্বনি বা ভাব-সৌন্দর্য প্রত্যাশিত, তা এই ধরনের মিলের মধ্যে ফুটে ওঠে না। আমার মনে হয়, এ-কথার মধ্যে যুক্তি আছে। প্রমথ চৌধুরীর সনেটে যুক্তব্যঞ্জনমূলক মিলের আধিক্য দেখতে পাই—আচার্য-শিরোধার্য-আর্য-উচ্চার্য ('ভাব'), ধন্য-পণ্য-নগণ্য-সৈন্য ('ধুতুরার-ফুল'), বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-প্রাণান্ত-একান্ত ('বিশ্ব-ব্যাকরণ'), সজ্জা-শয্যা-লজ্জা ('রোগ-শয্যা'), কুরঙ্গ-নারঙ্গ-তরঙ্গ-সারঙ্গ ('পাষাণী') ক্ষুদ্র-রৌদ্র-সমুদ্র-রুদ্র ('সনেট-সুন্দরী') ইত্যাদি। সত্য বটে, শব্দের ধ্বনি-মাধুর্য যাতে তন্দ্রাচ্ছন্নতার আবহাওয়া সৃষ্টি না করে, সনেটের সজাগ ভাবটা যাতে বজায় থাকে, সেজন্যই প্রমথ চৌধুরী যুক্তব্যঞ্জনমূলক মিল বেশি প্রয়োগ করেছেন, তবু মনে হয়, তাতে তাঁর সনেটের বিশেষ ছন্দ-ধ্বনি ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারেনি, যুক্তব্যঞ্জনমূলক মিলের ধ্বনি অনেকটা আঘাতের ধ্বনির মতো শোনায় বলে তাঁর সনেটের ভাবের আবেদনও অব্যাহত থাকেনি। সুতরাং ভালো সনেটে feminine rhyme-এর সংখ্যা যথাসম্ভব কম হওয়াই সঙ্গত। তাছাড়া সনেটের ভাষা প্রাঞ্জল ও মার্জিত হয়। দুর্বোধ্য আভিধানিক শব্দ ভাবেও অস্পষ্টতা আনে, তাই সনেটকারগণ অপরিচ্ছন্ন, অস্পষ্ট ও শিথিল ভাষা পরিহার করে চলেন।

এক কথায়, একটা সুদৃঢ় কাঠামোর মধ্যে কবির ঘনীভূত ভাবকে আশ্চর্য বাক্‌সংযমের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলাই সনেটের লক্ষ্য।

২

বাঙলা সনেটের ইতিহাস মধুসূদন থেকে শুরু। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় 'কবিমাতৃভাষা' নামক যে কবিতাটি রচনা করেন, তাই বাঙলা ভাষায় প্রথম সনেট। এবং তার অনেক আগে চর্যাপদে বা বৈষ্ণব পদাবলীতে যে সব চোদ্দ চরণের কবিতা পাওয়া যায়, উপরি-উক্ত লক্ষণগুলির প্রায় কোনটিই বর্তমান নেই বলে তাদের কোনমতেই সনেট বলা যায় না। শুধু চোদ্দ চরণ ও প্রতি চরণে পয়ারী মাত্রাসংখ্যা থাকলেই কোন কবিতা সনেট-পদবাচ্য হতে পারে না, সনেট হতে গেলে কবিতার আরও অনেকগুলি বহিরঙ্গ

ও অন্তরঙ্গ লক্ষণ থাকা চাই। চর্যাপদ বা বৈষ্ণবপদে সেই সব লক্ষণ কোথায়? দ্বিতীয় কথা, সনেট জিনিষটাই য়ুরোপাগত এবং সনেটের আকৃতি-প্রকৃতিও য়ুরোপের কবিদের দ্বারা গঠিত। তাই প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে চোদ্দ চরণের কবিতা থাকলেও সনেট ছিলো না এবং থাকা সম্ভব ছিলো না। তবে এটুকু অনুমান করা যেতে পারে যে, বাঙলা ভাষায় চোদ্দ চরণের কবিতা দেখে হয়তো মধুসূদনের মনে পড়েছিলো সনেট প্রবর্ত্তনের কথা।

সে যাই হোক, প্রথম সনেট রচনার কয়েক বছর পরে ফরাসী দেশে থাকার সময়ে মধুসূদন আবার সনেট রচনা শুরু করেন এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামে সনেট-সংকলন প্রকাশ করেন। মধুসূদনের 'কবিমাতৃভাষা' রচনার পরে একশ বছর কেটে গেলো। আজ বিচার করে দেখতে হবে, এক শতাব্দীর সাধনায় বাঙলা সনেট কতখানি উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং কতখানিই বা আমাদের কাব্যধারার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। সনেট রচনার সময়ে মাইকেল লিখেছিলেন—'আমি আমাদের ভাষায় সনেট প্রবর্তন করতে চাই। আমার বিনীত মত হচ্ছে এই যে, প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা অনুশীলন করলে কালক্রমে আমাদের সনেট ইতালীয় সনেটের সমকক্ষ হয়ে উঠবে।' কাব্যরসিকমাত্রই জানেন, সনেটের সাফল্য কিছুটা ভাষার অন্তর-প্রকৃতি ও শব্দসম্পদের ওপর নির্ভর করে। ইতালীয় ভাষার সঙ্গে খাপ খেয়েছে বলেই ইতালীয় সনেটের মর্যাদা আজ সর্বজনস্বীকৃত। ইংরেজী কাব্যসাহিত্যে সনেট ইতালীয় সনেটের মতো কৌলীন্য লাভ না করলেও সেক্সপীয়ার, মিল্টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীট্‌স্‌, রসেটির মতো সৃজনীপ্রতিভার স্পর্শে সনেট বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবু পাশ্চাত্ত্য দেশে বহুশতাব্দীব্যাপী চর্চার ফলে সনেটের যে মূল্য স্বীকৃত, একশ বছরের সাধনায় বাঙলা সনেটের সেই মূল্য ঠিক প্রত্যাশা করা যায় না।

মধুসূদন প্রথম সনেট-রচয়িতা হলেও তাঁর সাফল্য বিস্ময়কর। অবশ্য নিছক কবিত্বের দিক থেকে তাঁর সনেটগুলি 'মেঘনাদবধ' ও 'বীরাঙ্গনার' মতো সার্থকতা লাভ করেনি। মধুসূদনের প্রতিভারশ্মি যে এই সময়ে অস্তগামী

হয়েছিলো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রমিথিউস স্বর্গ থেকে আগুন নিয়ে এসেছিলেন, কবিও আগুন নিয়ে আসেন—সৃষ্টির আগুন। কিন্তু সনেট রচনার সময়ে মধুসূদনের সৃষ্টির হোমানল নির্বাণোন্মুখ—'মনঃকুণ্ডে অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি।' তাই তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে' কবিত্বের রসস্পর্শ খুবই কম।

তবে পেত্রার্ক, সেক্সপীয়ার ইত্যাদির মতো মধুসূদনের অন্তর-দ্বার সনেটে উদ্ঘাটিত। আমরা জানি, 'মেঘনাদবধ' ও 'বীরাঙ্গনায়' কবি শিল্পী-মানসের সমুচ্চ মহিমার স্বাক্ষর রেখে গেছেন—তিনি সেখানে বড়ো বেশি পোষাকী, তাঁর শিল্প-নিষ্ঠাই তাতে অভিব্যক্ত। অথচ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ ও উত্থান-পতনের ইতিহাস কম বিচিত্র নয়। সনেটের মধ্যে মধুসূদনের সেই ব্যক্তিসত্তা, সেই আটপৌরে মন যেন অনেকটাই ধরা দিয়েছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কবির জীবনে পত্নী হেনরিয়েটা অনেকখানি জায়গা জুড়েছিলেন, তিনি ছিলেন সুখ-দুঃখের নিত্য-সঙ্গিনী, মূর্তিমতী শান্তি ও সান্ত্বনা। কিন্তু এই হেনরিয়েটা সম্পর্কে মধুসূদনের ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথা একমাত্র সনেটে পাই। সুতরাং কবির জীবন-প্রত্যয় ও ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের দিক থেকে চতুর্দশপদী কবিতাবলীর সার্থকতা অনস্বীকার্য।

তাছাড়া রূপবন্ধের দিক থেকেও মধুসূদনের সনেটগুলির সিদ্ধি স্বীকার করে নিতে হয়। আদি সনেট রচয়িতার প্রাথমিক অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি সনেটের আদলটি ঠিক ধরতে পেরেছিলেন। পেত্রার্ক ছিলেন তাঁর আদর্শ, তবে তিনি সর্বত্র ইতালীয় কবির শিল্পরীতি অনুসরণ করতে চান নি, মিলের ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্বাধীনতা অবলম্বন করেছেন। সর্বত্র ভাবের আবর্তন-নিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে অষ্টক-ষট্ক বিভাগও করা হয়নি। কিন্তু এই সব ব্যতিক্রম সত্ত্বেও মধুসূদনের সনেটের ছন্দ ও আকৃতি তাঁর কলাকীর্তির প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। ইংরেজী সনেটের ছন্দ Iambic Pentameter-এর কথা স্মরণে রেখে তিনি যে চোদ্দ মাত্রার পয়ার ছন্দকেই সনেটের বাহন করেছিলেন, তাতে তাঁর ছন্দ-জ্ঞানের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দে, দুয়ের অধিক

পর্বসমন্বিত চরণ নিয়ে সনেট রচনা করলে তার গম্ভীর ছন্দ-ধ্বনি অব্যাহত থাকে কি ?

মধুসূদনের ঠিক পরবর্তী কবিরা সনেটের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি। হয়তো কবিত্ব-প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে সনেটের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ তাঁদের মনোহরণ করেনি। তবে নিরপেক্ষ বিচারে মনে হয়, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, এমন কি বিহারীলালের প্রতিভাও চতুর্দশপদী রচনার উপযুক্ত ছিলো না। অনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ, অত্যুৎসাহী বক্তৃতা ও অফুরন্ত বর্ণনার সাহায্যে সনেটের সংযম-দীপ্ত ও ভাব-গম্ভীর রূপমূর্তি নির্মাণ করা সহজ নয়।

সনেটের ইতিহাসে মধুসূদনের পরেই দেবেন্দ্রনাথ সেনের নাম করতে হয়। সনেট রচনায় তাঁর কৃতিত্বের রহস্য লুকিয়ে আছে তাঁর কবিধর্মের মধ্যে। তিনি হৃদয়ের আবেগ, যৌবনের মায়ামোহ ও প্রেমের সরল উচ্ছ্বাসে কাব্য রচনা করতেন—তাঁর কবিসত্তায় প্রবল ছিলো লিরিক অনুপ্রাণনা। সংযমকে আর্ট হিসেবে তিনি অনুশীলন করেন নি, তবু তাঁর কবি-প্রকৃতি স্বাভাবিক শক্তি বলেই সনেটের মধ্যে সংযত ও সংহত রূপ লাভ করেছে। তিনি সনেটের রূপকর্মে কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন—মধুসূদনের চোদ্দ মাত্রার চরণকে প্রয়োজন মতো আঠারো মাত্রায় প্রসারিত করেছেন তিনি। পদান্তের মিলের ক্ষেত্রে যেমন বিশ্বস্তভাবে সেক্সপীয়ার ও পেত্রার্ককে অনুসরণ করেছেন, তেমনি উভয় রীতির সংমিশ্রণে নতুন ঢঙের সনেট রচনারও প্রয়াস পেয়েছেন। অষ্টক ও ষট্ক বিভাগ সর্বত্র শিল্প-সুন্দর হয়ে ওঠেনি। তবু সমগ্রভাবে বিচার করলে তাঁর চতুর্দশপদীগুলিকে সনেট বলেই মনে হয়।

অক্ষয়কুমার বড়াল অসংযমী কবি ছিলেন না, তাই সনেটের রূপ ও ধর্ম তাঁর রচনায় অক্ষুণ্ণ আছে। তাঁর সনেটে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের চেয়ে মনের ভাবনা প্রধান, তাই সেখানে বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিকের সুন্দর সামঞ্জস্য দেখতে পাই। তিনি চোদ্দমাত্রার চরণই পছন্দ করতেন, মিল ও অষ্টক-ষট্ক বিভাগেও মূলাদর্শের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি নিষ্ঠা দেখিয়েছেন। নিখুঁত পেত্রার্কীয় সনেট রচনায় তাঁর কুশলতা যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি পেত্রার্কীয়

ঢঙের সনেটের শেষে সেক্সপীরীয় পয়ারপুচ্ছ জুড়ে দিয়ে নতুন ঢঙের সনেট সৃষ্টি করেছেন। আমার তো মনে হয়, দীর্ঘ কবিতার চেয়ে সনেটেই যেন অক্ষয়কুমারের কৃতিত্ব অধিকতর। যেমন—

স্নেহময়ী মাতা ওই দিবা অবসানে, ক
চঞ্চল বালকে তাঁর, ছুটি হাতে ধরি', খ
কত ছলে, কত বলে, কত স্নেহে, মরি, খ
পথ হ'তে ল'য়ে যান নিজ গৃহ পানে! ক
যায় শিশু—চায় পিছে কাতর নয়ানে— ক
কত সাধ, কত আশা, কত ধূলা পড়ি'! খ
বাধে পদ, উঠে দুঃখে কাঁদিয়া গুমরি',— খ
'মাগো, আর কিছুক্ষণ খেলি এইখানে! ক

হা প্রকৃতি—জননী গো! জীবন-সন্ধ্যায় চ
ওই মূঢ় শিশু সম, না বুঝে' তোমার ছ
স্নেহ-আকর্ষণে—ভাবি মরণ-তাড়না! জ
পলাইতে তোমা হ'তে পড়িয়া ধূলায় চ
আঁকড়িয়া ধরি বুকে ধূলার সংসার— ছ
রোগ, শোক, হাহাকার, অভাব লাঞ্ছনা! জ

—সন্ধ্যায়, শঙ্খ।

বড়াল-কবির এই সনেট অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ ও মিল-বন্ধনের দিক থেকে নিখুঁত। পেত্রার্কীয় মিলের পদ্ধতি এখানে বিশ্বস্তভাবে অনুসৃত। অষ্টকের আট চরণে সন্ধ্যায় মায়ের কাছে সন্তানের আর একটু খেলবার সুযোগ প্রার্থনা এবং মায়ের ছলে বলে সন্তানকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার কথা আছে। ষট্‌কে এই ভাবেরই তাৎপর্য মানুষ ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে আরোপিত। সুতরাং

দেখা যাচ্ছে, যে ভাবকল্পনা অষ্টকে বিলসিত, ষট্‌কে তার মধ্য থেকেই একটা বুদ্ধিবৃত্ত গভীরতর চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে—কবি এই দুই ভাগের মধ্যে সূক্ষ্ম যোগ রক্ষা করেও চিন্তার মোড় সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে দিতে পেরেছেন। প্রথমাংশের করুণ-মধুর ছবি ললিত বিস্তারে উচ্ছ্বসিত হতে পারতো, কিন্তু দ্বিতীয়াংশের ছয়টি চরণ সেই সম্ভাবিত উচ্ছ্বাসকে একটা সংযত-শোভন ভাবনার বৃত্তে শোষণ করে নিয়েছে। সব মিলে সনেটটির রস-রূপ নিটোল মুক্তোর মতো প্রতিভাত।

তারপর আসে রবীন্দ্রনাথের কথা। তাঁর কবিমন রোমান্টিক; তবে সেই রোমান্টিকতার মধ্যেও আত্মস্থতা আছে। তবে কবিগুরুর রোমান্টিক মনের আত্মস্থতা আর লিরিক-কল্পনার ক্লাসিক্যাল ঝোঁক এক কথা নয়। যে শান্ত বিশ্বাস, আশাবাদী-পুরুষার্থ ও অধ্যাত্ম-বিবেক রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মানসপ্রবণতার মুখে লাগাম জুড়ে দিয়েছে তা কতকটা ভারতবর্ষ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দান, আর কতকটা রবীন্দ্রনাথের উচ্চচূড় প্রতিভার স্বভাবধর্ম। অন্যদিকে ক্লাসিক্যাল ঝোঁকের মূলে থাকে একটা চিরায়তিবোধ, পরিমিতিজ্ঞান, প্রত্যক্ষ ও সরল প্রকাশধর্ম। সনেটের লিরিক-কল্পনায় যে ক্লাসিসিজমের ঝোঁক থাকে, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মানসের আত্মস্থতার ভেদ আছে।

রবীন্দ্রনাথের এই আত্মস্থতা তাঁর রোমান্টিকতার অনুষঙ্গেই তাৎপর্যপূর্ণ। তাকে ক্লাসিসিজম্-এর ঝোঁক বলে গ্রহণ করার কোন কারণ নেই। মধুসূদনের ক্ষেত্রে ক্লাসিসিজম্ উপস্থিত, তবে তাঁর নিজের ভাষায়—'I have a tendency in the lyrical way'। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের মনের 'tendency in the lyrical way'-টাই সবচেয়ে বড়ো সত্য। এই কারণেই আমার মনে হয়, কবিগুরুর মনের গড়ন সনেট রচনার পক্ষে ঠিক উপযুক্ত ছিলো না। সনেটের উজ্জ্বল রূপাবয়ব নির্মাণ করতে হলে শুধু রোমান্টিক মনের আত্মস্থতা থাকলেই চলে না, অনেকখানি ভাবকে স্বল্পতর ভাবনায় সংহতি দিয়ে একটা নিরেট মূর্তির মধ্যে ফুটিয়ে তোলার জন্য গভীর ও গম্ভীর, সত্য ও সরল,

পরিমিত ও চিরায়ত চেতনা থাকা চাই (তবে মহাকবির ক্লাসিক্যাল 'দৃষ্টিভঙ্গি' আর সনেটের ক্লাসিক্যাল 'ঝোঁক'-এর পার্থক্য মনে রেখেই এ-কথাগুলি বলা হলো।) রবীন্দ্রনাথের তা ছিলো না আর ছিলো না বলেই খাঁটি সনেট তাঁর হাতে গড়ে ওঠেনি।

দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ কখনই ভারতচন্দ্র বা মধুসূদনের মতো শিল্পসচেতন কবি ছিলেন না। এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর কাব্যের আঙ্গিক বৈচিত্র্যহীন ও উপেক্ষণীয়। বরং তাঁর প্রাণের আগুন নিত্য নতুন ফর্ম সৃষ্টি করে গিয়েছে—এ অনস্বীকার্য সত্য। তবে তাঁর শিল্পী-মন কখনই সচেতনভাবে ফর্মের অনুশীলন করেনি। আলঙ্কারিক ভাষায় বলা যায়, তাঁর ভাব ও ভাষা একই মানসিক বেগ বা প্রযত্নের সৃষ্টি। বীজ যেমন নিজেকে প্রকাশ করতে গিয়ে গাছের সৃষ্টি করে ফেলে অথচ কি সৃষ্টি করছে নিজে জানে না, তেমনি কবির ভাবও নিজের অজ্ঞাতসারেই নানা রূপের আরতি করে গিয়েছে। ফর্মটাও যে আলাদা চর্চার বিষয় এটা তিনি কাব্যে তেমন স্বীকার করে নিয়েছেন বলে মনে হয় না। অথচ সনেট রচনায় কবির আঙ্গিক-চেতনা প্রবল না হলে চলে না। প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ ফর্ম-এর সজ্ঞান অনুশীলন করতে ভালবাসতেন না, দ্বিতীয়তঃ বন্ধনমাত্রই তাঁর কবিমনের বিরোধী ছিলো—ফলে সনেটের কলারীতি রবীন্দ্রনাথের কলমে সার্থক না হওয়াই স্বাভাবিক।

তবে রবীন্দ্রনাথ যে চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেছেন, তাদের কাব্যসৌন্দর্য সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে না। ভাবের অখণ্ডতায়, প্রকাশের গভীরতায় সেগুলি ঘনপিনদ্ধ অথচ স্বচ্ছ রূপ লাভ করেছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে কবিতাগুলি সাতটি পয়ার শ্লোকের নামান্তর মাত্র, কোথাও কোথাও অষ্টম চরণের পরেও অষ্টকের ভাবের বিস্তারে কবিতার ভারসাম্য বিধ্বস্ত। তবে তা সনেটপদবাচ্য না হোক, কবিতাপদবাচ্য তো বটেই। অবশ্য তাঁর কয়েকটি চতুর্দশপদীকে মোটামুটিভাবে সনেট বলা যেতে পারে।

কাব্যের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী প্রধানতঃ সনেটকার। তাঁর মনের ধাত সনেট রচনার অনুকূল ছিলো। অন্যদিকে সনেটের নিরেট প্রতিমায় শিল্পের তুলি

বুলোবার যথেষ্ট সুযোগ থাকে, এই কারণেও আর্টের ভক্ত প্রমথ চৌধুরী সরস্বতীর বীণায় সনেটের ইস্পাতী তার চড়িয়েছেন বলে নিজেই স্বীকার করেছেন। 'সনেট-পঞ্চাশতে' কবি প্রথমেই প্রণাম জানিয়েছেন গুরু পেত্রার্ককে, কিন্তু তাঁর সনেট বিশ্লেষণ করলে রূপবন্ধের দিক থেকে ইতালীয় সনেটের অনুসরণ অনেক স্থলেই চোখে পড়ে না। তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পাই—'আমি যদিও তাঁর (পেত্রার্কার) পদানুসরণ করিনি, তবুও পেত্রার্কার চরণ বন্দনা করে আসরে নামি।···আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি ফরাসী সনেটের ছাঁচই অবলম্বন করেছি।' অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর সনেটের আদর্শ প্রধানতঃ ফরাসী, বিশেষ করে 'সনেট-পঞ্চাশতে'। তবে 'পদ-চারণের' অনেকগুলি কবিতা ইতালীয় সনেটের অনুরূপ (ব্যতিক্রমঃ বর্ষা, আমার সমালোচক, বন্ধুর প্রতি, সনেট-সপ্তক, থর্সাং ইত্যাদি)। উদাহরণ—

বসন্তের আগমনে আজো আছে দেরি ক
পর্বতের স্তরে স্তরে বিরাজে তুষার খ
চুরি করে' ফিকে রঙ্ গোলাপী উষার, খ
লাজমুখে ফুটিয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে চেরি! ক
পত্রহীন শাখাগুলি ফেলিয়াছে ঘেরি, ক
বর্ষিয়া তাহার অঙ্গে কুঙ্কুম-আসার। খ
সে জানে, যে বোঝে অর্থ ফুলের ভাষার, খ
বসন্তের ঘোষণার তুমি রত্নভেরী! ক

মর্মর-কঠিন-শুভ্র তুষারের গায়ে চ
পড়েছে রূপের তব রঙীন আলোক, ছ
পূর্বরাগে লিপ্ত তব কর-পরশনে, জ
শিশিরে বসন্ত-স্মৃতি তুলেছে জাগায়ে। চ
রক্তিম আভায় যেন ভরিয়া ত্রিলোক ছ
শোভিছে উমার মুখ শিব-দরশনে। জ

উদাহরণটির মিল-বিন্যাস যেমন আদি সনেটের আদর্শসম্মত, তেমনি অষ্টক ষট্‌কের ভাবগত আবর্তন-নিবর্তন আদি সনেটকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আর যেখানে তিনি ফরাসী আদর্শের পূজারী, সেখানে তাঁর কবিতা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"তন্বী, আর ওর দশনপংক্তি শিখরওয়ালা, একটিও ভোঁতা নেই—'মধ্যে ক্ষামা,' দুই লাইনের কটিদেশটি খুব আঁট—তার উপরে 'চকিত হরিণী প্রেক্ষণা।' শুধু তাই নয়, "এর কোন লাইনই ব্যর্থ নয়—এ যেন ইস্পাতের ছুরি, হাতীর দাঁতের বাঁটগুলি জহুরির নিপুণ হাতের কাজ করা।" কিন্তু এসব গুণ সত্ত্বেও প্রমথ চৌধুরীর সনেটে 'art-এর চেয়ে artificiality'টাই বেশি।

এ-প্রসঙ্গে কান্তিচন্দ্র ঘোষ ও রাধারাণী দেবী স্মরণীয়। ফরাসী আদর্শানুগ সনেট রচনায় এঁরা প্রমথ চৌধুরীর দোসর। পেত্রার্কীয় ও সেক্সপীরীয় সনেটের মধ্যে যে মনোভঙ্গির প্রকাশ, ফরাসী সনেটের পক্ষে তা উপযুক্ত নয়। কান্তিচন্দ্র ও রাধারাণী দেবী প্রমথ চৌধুরীর সংস্পর্শে এসেই বোধহয় ফরাসী ধাঁচের সনেট রচনার প্রেরণা পান, কিন্তু গুরুর আদর্শ এঁরা কতটা রক্ষা করেছেন বিচার করে দেখা দরকার।

সে যে জেগেছিল মোর বাঁশরীর সুরে, ক
আমার নয়নপাতে ফুটেছিল রূপে। খ
পরশে সঙ্কোচ ছিল, কথা চুপে চুপে, খ
দৃষ্টি ছিল কল্পলোকে কোথায় সুদূরে। ক

সেই রজনীটি মোর এই মর্ত্যপুরে ক
পরিশ্রান্ত মিলনের তীব্র গন্ধধূপে খ
মিশিল আজিকে কোথা—স্মৃতিঅন্ধকূপে খ
হারানু কবে না জানি ক্ষণিকা বধূরে। ক



মুহূর্তের জ্বালা শুধু, যে গিয়াছে যাক্, গ
অতীতের বাঁধা বীণা রহুক, নির্বাক। গ

আমার মানস-কুঞ্জে আমি জানি তবু চ
ব্যর্থ হয় নাই সেই অভিসার রাতি ; ছ
মানসী প্রিয়া সে মোর ভোলে নাই কভু, চ
জ্বালিয়া রেখেছে চিরমিলনের বাতি ॥ ছ

—সনেট।

মিল-চিহ্নের দিকে লক্ষ্য রাখলে স্পষ্টই বোঝা যায়, বহিরঙ্গের দিক থেকে কান্তিচন্দ্রের এই সনেট ফরাসী আদর্শ-অনুসারী। তাঁর চতুর্দশপদীর শেষ-চার চরণে যে মিল-স্বতন্ত্র্য আছে, তাও বৈচিত্র্য হিসেবে স্বীকার্য। আর ফরাসী সনেটের ত্রিভঙ্গ দেহডৌলও অক্ষুন্ন আছে। মূলাদর্শের অন্তরঙ্গ স্বভাব আপন আপন চতুর্দশপদীতে ফুটিয়ে তুলতেও তিনি সক্ষম হয়েছেন। তবে প্রমথ চৌধুরী যেমন আয়রনি ও স্যাটায়ার প্রকাশের জন্য অনেক ক্ষেত্রে ফরাসী সনেটের ত্রিধা-বিভাগের সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছেন, তেমন কোন চেষ্টা কান্তিচন্দ্র ও রাধারাণী দেবীর মধ্যে লক্ষ্য করিনে। ফরাসী আদর্শ সম্পর্কে বাঙালী কবিদের একটা অনিচ্ছা আছে বলে মনে হয় ; কারণ এই আদর্শ ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশের পক্ষে যতটা, সাধারণ সুখ-দুঃখ প্রেম-ভালোবাসা প্রকাশের পক্ষে ততটা উপযুক্ত বলে তাঁরা মনে করেন না। অবশ্য এ-ধারণা যে সত্য নয়—তার প্রমাণ আছে রঁসার্দ, কান্তিচন্দ্র, রাধারাণী দেবী, এমন কি প্রমথ চৌধুরীর কয়েকটি সনেটে।

প্রমথ চৌধুরীর পরে আর একজন শক্তিমান সনেট রচয়িতা হচ্ছেন মোহিতলাল মজুমদার। তাঁর কবিতায় লিরিক অনুভূতির অভাব নেই, অথচ বুদ্ধির ছাপও তাতে আছে। অন্যদিকে তিনি দেহবাদী কবি—রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ প্রেমানুভূতির যুগে দেহের বেদীতে passion-এর রূপারতি বিদ্রোহের

নামান্তর। কিন্তু কবির ব্যক্তিত্বের আভিজাত্য তাঁর কবিতার ভাব ও ভঙ্গির মধ্যে একটা সংযত-সুন্দর গম্ভীর-গভীর ক্লাসিক্যাল ঢঙ এনে দিয়েছে। আর তারই জন্য সনেটের ক্ষেত্রে মোহিতলালের সিদ্ধি তর্কাতীত হয়ে উঠেছে। অন্তরের লিরিক-অনুভূতিকে সংযমের শাসনে ক্লাসিক্যাল গঠন দিতে পেরে-ছিলেন—তাই তাঁর সনেট সুডৌল ও দৃঢ়পিনদ্ধ একটি রূপমূর্তি। অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ ও মিল-যোজনায় মোহিতলাল স্বীকার করে নিয়েছেন ইতালীয় সনেটের আদর্শ।

অতি আধুনিক কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দের কথা উল্লেখ করতে চাই। সুধীন্দ্রনাথ কুশলী সনেট-রচয়িতা। বিদ্যা ও মননের জগতের অধিবাসী বলেই এঁর হাতে সনেটের আঁটসাঁট রূপবন্ধ সুন্দর হয়ে উঠেছে। বিষ্ণু দে বস্তুচেতনা ও যুগচেতনার কবি, তাই তাঁর চৈতন্যধর্ম হৃদয়বৃত্তির উচ্ছলতাকে শাসন করে ধ্রুপদী আঙ্গিকে অভিব্যক্তি খুঁজেছে। শব্দ চয়নে, বাক্যগঠনে ও চিত্রকল্পে অসংযমের প্রশ্রয় তাঁরা দেননি, অথচ চৈতন্যের বুকে অনুভূতির স্পন্দন জাগিয়ে কাব্যের আস্বাদ দিতে তাঁরা ভোলেন নি। সেক্সপীরীয় রূপবন্ধে সুধীন্দ্রনাথের নিপুণতা সত্যিই প্রশংসনীয়, বিষ্ণু দে পেত্রার্কীয় ও সেক্সপীরীয় এই উভয় রীতির ওস্তাদ শিল্পী। এখানে বুদ্ধদেব বসুর কথা একটু বলা দরকার। তিনি গীতিকবি, রোমান্টিক কবি। ভাব ও ভাষার ললিত বিস্তারে তাঁর ক্লান্তি নেই। অথচ তাঁর হাতেও আশ্চর্য সুন্দর সনেট গড়ে উঠেছে। এ থেকেই প্রমাণ হয়, তিনি জাতশিল্পী—প্রয়োজনবোধে অনেকখানি ভাবোচ্ছ্বাসকে তিনি 'মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে নিতে পারেন' বলেই সনেটেও তাঁর সিদ্ধি ঘটে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—

মোরে ক্ষমা করো, প্রেম! তোমারে করেছি উপহাস, ক
তীব্র বিদ্যুতের তীর করিয়াছি তোমার সন্ধান, খ
উড়ায়ে দিয়েছি ঊর্ধ্বে বিদ্রোহের—যুদ্ধের নিশান; খ
খর-তরবারি-সম ঝলসিত তীক্ষ্ণ অবিশ্বাস। ক

ক্ষমা করো, ক্ষমা করো! মোর উচ্চহাসির উচ্ছ্বাস, ক
শোনো নাই তার মধ্যে স্পন্দমান কান্নার তুফান? খ
তুমি তো জানিতে, প্রেম, বিদ্রূপ তোমারি স্তবগান, খ
তোমারি বিরহ ক্ষোভ বিদ্রোহের উন্মত্ত উল্লাস। ক

আমার সমস্ত প্রাণে, হৃদয়ের রক্তের সঞ্চারে চ
আজ তুমি এলে, প্রেম, বজ্রস্বরে বিদ্যুৎ বার্তায়, ছ
ঝড়ের আগ্রহে এলে বন্যাবেগে, অস্থির বাত্যায়। ছ
হৃত-অস্ত্র, ভগ্ন-ধ্বজা, পরাজিত শত্রু তব দ্বারে চ
আশ্রয় মাগিছে আজ; দয়া করে তুলে নাও তারে, চ
তোমার অমৃতস্পর্শ দাও তার অসুস্থ আত্মায়। ছ

—ক্ষমাপ্রার্থনা, কঙ্কাবতী।

এখানে 'বার্তায়-বাত্যায়' মিলের দুর্বলতা ছাড়া আর কোন ত্রুটি নেই। সনেটের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধনায় কবির সিদ্ধি প্রশ্নাতীত।

বাঙলা কাব্যে সনেট রচয়িতার সংখ্যা গণনাতীত, পরিসরের অল্পতার জন্য শুধু বিশিষ্ট কয়েকজনের কথা আলোচনা করা গেল। সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যায়, বাঙলা ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট সনেট রচিত হয়েছে, বাঙালী কবির সাধনায় তার প্রচুর উন্নতি ঘটেছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা যায়, সনেটের নামে অজস্র চোদ্দ চরণের কবিতা বাঙলা কাব্যের অঙ্গন ভরিয়ে তুলেছে। কবিরা যদি সনেটের আঙ্গিক সম্পর্কে আরেকটু সচেতন হয়ে কবিতা রচনা করেন, তবে এই বিশিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁদের সিদ্ধি আরও প্রশংসনীয় হয়ে উঠবে, মধুসূদনের স্বপ্নও হবে সার্থক।

৩

ত্রিবিধ সনেটের যে সব বৈশিষ্ট্য পূর্বে আলোচনা করেছি, বর্তমান সংকলনের সনেটগুলিতে সর্বত্র তাদের বিশ্বস্ত অনুসরণ নেই। বস্তুতঃ কঠোর নিয়মানুগত্যের

দৃষ্টিতে দেখলে কতকগুলি সনেটকে বর্জনীয় বলে মনে হবে। সংকলনের যে রূপ দাঁড়িয়েছে, তাতে আমি পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট নই। শুধু এইটুকু বলতে পারি, যে কবিতাগুলিকে মোটামুটিভাবে সনেট বলে মনে করেছি তাদেরই দ্বারা সংকলনের ডালা সাজিয়েছি। চতুর্দশপদী কবিতামাত্রকেই আমি সনেট বলে ধরিনি এবং সেজন্যই সংকলনে নির্বিচারে তাদের কোন স্থান হয়নি। পয়ারী মিলের কবিতা, মিলের ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার আছে এমন কবিতা এখানে দেখতে পাওয়া যাবে না। অবশ্য সেক্সপীরীয় সনেটের তিনটি চৌপদীতেই যদি ভিন্ন ভিন্ন মিল নাও থাকে, পেত্রার্কীয় সনেটে যদি মিলের পদ্ধতি কখখক কখখক না হয়ে কখকখ কখকখ হয়েও থাকে, তবু তাদের গ্রহণ করেছি। ভাবের আবর্তন-নিবর্তন সর্বত্র স্পষ্ট নয়, এমন কবিতাও হয়তো আছে। নিয়মের এটুকু শৈথিল্য সহনযোগ্য বলে মনে করি। তবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের রচিত চতুর্দশপদী কবিতার সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যাবে না, কারণ নাচুনে ছন্দে সনেটের ছন্দ-সঙ্গীত অক্ষুণ্ণ থাকে না। আর সেজন্যই মনীশ ঘটকের 'শিলালিপির' চতুর্দশপদীগুলির কবিত্বে মুগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি। জীবনানন্দ দাশের চতুর্দশপদীগুলিরও সনেট হিসেবে নানা দোষ আছে—চরণগুলি অতিদীর্ঘ ও দুয়ের অধিক পর্বসমন্বিত, মাত্রাযোজনাও সর্বত্র বিচারসম্মত নয়। তাই তিনি আমার প্রিয় কাব হলেও তাঁর কবিতা বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি।

যেমন কারো কারো কবিতা আমি স্পষ্ট কারণেই বাদ দিয়েছি, তেমনি কারো কারো কবিতা হয়তো আমার চোখ এড়িয়ে গেছে। সংকলনের পরিসর নির্দিষ্ট হওয়ায়, অনুমতি গ্রহণ ও আর্থিক সমস্যা জড়িত থাকায় আমি সকলের প্রতি সুবিচার করতে পারিনি। তার জন্য কবিদের কাছে এবং তাঁদের অনুরাগীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সংকলনে সকলের কবিতার সংখ্যা সমান নয়, তার একাধিক কারণ আছে। শুধু এইটুকু বলতে পারি, কবিতার সংখ্যাকে কবিদের গুণাগুণের সূচক হিসেবে পাঠকেরা যেন গ্রহণ না করেন।

বিচারবুদ্ধি সকলের সমান নয়, জনে জনে রসরুচির পার্থক্যও দেখা যায়। সংকলনের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সবচেয়ে বেশি প্রকাশ ঘটে; সংকলনের কাজ চলে সংকলনকর্তার রুচি ও বিচার অনুযায়ী। তাই বর্তমান গ্রন্থের কবিতাগুলি সকলের মনোরঞ্জন না-ও করতে পারে। আমার দিক থেকে শুধু এইটুকু বলার আছে যে, আমি জ্ঞানতঃ কবিসমাজ ও পাঠকদের প্রতি অবিচার করিনি। যদি এই সংস্করণ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হয়, তবে ভবিষ্যৎ-সংস্করণে সমালোচক ও পাঠকদের পরামর্শ যথাযোগ্যভাবে বিবেচনা করে গ্রন্থটির পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করবো। যে সমস্ত কবি তাঁদের কবিতা অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দিয়েছেন, তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর বর্তমান উত্তরাধিকারীর সন্ধান না পাওয়ায় বা ঠিকানা না জানায় কারো কারো কবিতা বিনা অনুমতিতেই গ্রহণ করেছি। তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সিগনেট প্রেস প্রকাশিত 'অর্কেস্ট্রা' ও 'সংবর্ত' থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের যে সনেটগুলি নিয়েছি, তা স্বয়ং কবি ও সিগনেট প্রেসের পক্ষে শ্রী নীলিমা দেবীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত।

এই সংকলনের সহযোগী সম্পাদক শক্তিব্রত ঘোষ আমার পরম স্নেহভাজন ও পূর্বতন সহকর্মী। তিনি নিজে কবি ও সমালোচক। তাই কবিতার বিচারে তাঁর রসবোধ ও বিশ্লেষণশক্তির ওপর অনেকটা নির্ভর করেছি। এই সংকলনের মধ্যে যদি প্রশংসনীয় কিছু থাকে, তবে তা শক্তিব্রতর প্রাপ্য। আর নিন্দার ভাগ আমার জন্য রইলো। গ্রন্থসংকলনে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি কানাই সামন্ত, শুভেন্দু ঘোষ, গোপাল ভৌমিক, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, সাধন চট্টোপাধ্যায় ও অবনীরঞ্জন রায়ের কাছ থেকে। তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি-নমস্কার জানাচ্ছি। অলমিতি

জীবেন্দ্র সিংহরায়

মধুসূদন দত্ত

কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অসংখ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কতকাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন
অশন শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।

বঙ্গকুললক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—‘হে বৎস দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে ?’

কাশীরাম দাস

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি,
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।

কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
সাগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন ;

সেই রূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে !
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্ ॥

নূতন বৎসর

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউয়ের গমনে।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে
কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে!
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল!

বাড়িতে লাগিল বেলা; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা,— তপনের দূতী, অরুণ-রমণী!

সায়ংকালের তারা

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরী,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে ?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির ? কি ফণিনী, যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে ?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু ? ভাল কি তোমা বাসে না শর্বরী ?

হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল-সনে,
যবে কেলি করে তারা সুহাস-অম্বরে ?
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গণে,—
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে !

ব্রজ-বৃত্তান্ত

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী ?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি
অশ্রু-ধারা ; মুকুতার কম রূপ ধরি ?
বিন্দা,— চন্দ্রাননা দূতী— ক মোরে, রূপসি
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি,
নব রাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি ?-

বঙ্গের হৃদয়-রূপ রঙ্গ-ভূমি-তলে
সাঙ্গিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা ?
কোথায় রাখাল-রাজ পীতধড়া গলে ?
কোথায় সে বিরহিনী প্যারী চারুশীলা ?—
ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিস্মৃতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা।

গোবিন্দচন্দ্র দাস

প্রণয়

হইল তুষার-শুভ্র কাল কেশরাশি,
খসিল মুকুতাসম বিমল দশন,
নিমগ্ন অধর প্রান্তে ডুবে মরে হাসি,
গ্রাসিল বিকট জরা জীবন যৌবন।

প্রবৃত্তি বাসনা যত ক্রমে দূরে যায়,
দূরে যায় সংসারের পাপ প্রলোভন,
উদ্যম উৎসাহ আশা ডুবিছে সন্ধ্যায়,
বিমল বৈরাগ্যে যেন ভেসে গেছে মন।

ভেবেছিনু প্রেম অন্য বাসনার মত,
জরায় হইয়া জীর্ণ ক্রমে হবে লীন,
কিন্তু এ বার্ধক্যে দেখি বাড়ে ক্রমাগত,
আগেকার শতগুণ নেশায় নবীন।

হেরিয়া রমণী হাসে এ কি রে বালাই,
পোড়া প্রণয়ের বুঝি জরামৃত্যু নাই ?

বিক্রমপুর

বিস্তীর্ণ বিশাল পদ্মা বিনাশ-অক্ষরে,
সৈকতে লিখিয়া যায় গত ইতিহাস,
হংস, বক, কাদাখোঁচা বালুচরে চরে,
পদচিহ্নে পরিশিষ্ট করিছে প্রকাশ।

আদিশূর যজ্ঞভূমি হবিঃসিক্তস্থল,
তরঙ্গে লেহিয়া লোভে আজিও ধোয়ায়,
কনোজী ব্রাহ্মণপঞ্চ প্রতিভা-অনল,
প্রজ্বলিত বেদমন্ত্র সুপ্ত বালুকায়।

বিলুণ্ঠিত রত্নাকর ছিল 'সমতটে',
'রামপালে' পায় চাষা স্বপ্ন কত তার,
'রাজনগরের' কীর্তি শত' রত্নমঠে,
প্রগল্‌ভ স্পর্ধিত ফেনে ভাসিছে তাহার।

বল্লালের দগ্ধ অস্থি ভস্ম কহিনুর,
তোমার পথের ধূলি হে বিক্রমপুর !

দেবেন্দ্রনাথ সেন

রবীন্দ্রবাবুর সনেট

হে রবীন্দ্র, তোমার ও সুন্দর সনেট
কি সরস ! নারিঙ্গির সুরভি সমীরে,
মুক্ত-বাতায়নে বসি ক্ষুদ্র জুলিয়েট,
ফেলিছে বিরহশ্বাস যেন গো সুধীরে !

আধেক নগন তনু বাকল-ভূষণে,
মালিনীর তীরে যেন বালিকা সুন্দরী ;
সলিলে কাঁপিছে শশী ; চঞ্চল নয়নে
কাঁপে তারা, কাঁপে উরু গুরু গুরু করি !

নব বলয়িতা লতা বালিকা যৌবন
শিহরিয়া উঠে যথা সমীর পরশে,
লাজে বাধ বাধ বাণী, রূপের আলসে
ঢল-ঢল তোমার ও কবিত্ব মোহন !

পাঠ করি, সাধ যায়, আলিঙ্গিয়া সুখে
প্রিয়ারে, বাসন্তী নিশি জাগি সকৌতুকে !

শ্রাবণ

মূর্তিমতী বর্ষা তুই ! রিম ঝিম করি
পড়ে জল ; হে করুণ, হে চিরদুঃখিনী,
কত মেঘ আছে তোর প্রাণের ভিতরি ?
কত গরজন আছে ; কত বা অশনি ?

প্রকৃতির লীলাখেলা বুঝিবারে নারি !
তোর চক্ষে অবিরল বহে বারিধারা ;—
ময়ূর ময়ূরী নাচে কলাপ প্রসারি ;
কদম্ব ফুটিয়া উঠে পাগলের পারা !

বিধি হে ! গড়েছ তুমি কোন্ উপাদানে
অপূর্ব মানব-চিত্ত ? শোকের কাহিনী
শুনিলে, প্রাণের তারে বাজে এক তানে,
বসন্তবাহার আর পাহাড়ী রাগিণী !

গুরু গুরু গরজন ; চমকে দামিনী ;
তবু ফোটে জাতি, যূথী, মল্লিকা, কামিনী !

আয়ান

চক্ষুষ্মান্— হে আয়ান !— তবু তুমি আঁধা
জড়পিণ্ড-প্রায় তুমি থাক চিরদিন !
দেখেও কি দেখ না'ক ? হইয়া স্বাধীন,
বিলাস-বিভ্রমে ভ্রমে কলঙ্কিনী রাধা !

বিপণি, অরণ্য, গোষ্ঠ, যমুনা-পুলিন
যথা তথা গতি তার, নাহি মানে বাধা ;
নিতি নিতি নববেশ !— চাহনি রঙ্গিন !
মোহিনী মায়ায় বুঝি বিশ্ব যাবে বাঁধা ?

কদম্ব শিহরি উঠে ; বাঁশরী ফুকারে ;
গোপ গোপিনীর পদ পড়ে তালে তালে ;
সারা ব্রজ পড়ে ধরা কুহকের জালে ;
এ নাগরী নাগরালি, বুঝিতে কে পারে ?

হে আয়ান ! হে সাংখ্যের পুরুষ মহান্ !
রাধিকা-প্রকৃতি তোমা ক'রেছে অজ্ঞান !

রাক্ষসী

বসন্তের উষা আসি' রঞ্জি দিল যুগল-কপোলে,
তাই ও ফুলের বাস, ফুল-হাসি আননে প্রিয়ার !
নিদাঘের রৌদ্র আসি বিলসিল ললাট-নিটোলে,
তাই গো প্রিয়ার ভালে জ্যোতি খেলে মহিমা-ছটার !

ঘন-ঘোর বর্ষা-রাতি বিহরিল অলক-নিচোলে,
তাই গো প্রিয়ার পিঠ কেশ-মেঘে সদা মেঘাকার !
নাচিল শরৎ-শশী রূপ-হ্রদে হিল্লোলে হিল্লোলে,
তাই গো প্রিয়ার দেহ কূলে-কূলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার !

রাহু, কেতু—দুই ঋতু, শীত ও হেমন্ত শুধু হায়,
প্রিয়ার হৃদয়ে পশি' ছড়াইল কঠিন তুষার !
তাই প্রিয়ে ! তাই বুঝি সুকঠিন হৃদয় তোমার ?
উপাসনা আরাধনা সকলি ঠেলিয়া দাও পায় !

আমি গো বুঝিতে নারি— দেবী তুমি, অথবা রাক্ষসী !
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তুমি, কিম্বা ঘোর কৃষ্ণা চতুর্দশী !

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

এস

উন্মুক্ত করেছি হৃদি-কুটীরের দ্বার,
কে আছ আশ্রয়-হীন এস, এস ভাই !
সবারে রাখিতে প্রাণে সাধ মোর যায়,
সবারি মাঝারে আমি মিলাইতে চাই ।

ভালবাসিতাম আগে বিরল নির্জন,
পত্রের মর্মর মৃদু— ঘুঘুটির গান ;
এখন একেলা থাকা বড়ই যাতন,
উঠিছে প্রাণের মাঝে মিলনের তান !

তোমাদেরি সুখে দুখে মিশাইয়া প্রাণ,
সাধ— হারাইব এই তুচ্ছ সুখ-দুখ ;
তোমাদেরি মাঝে থেকে লভি নব প্রাণ,
দেখিবারে পাই যদি সন্তোষের মুখ ।

এস সবে, পারি যদি হারাতে আপনা,
জীবন-সমুদ্র-জলে ক্ষুদ্র বারি-কণা !

অক্ষয়কুমার বড়াল

কত দিন পরে

কতদিন পরে আজ— কত দিন পরে,
সে স্মৃতি-কুহুকে চিত চমকে আবার!
বিশীর্ণ কল্পনা-ফল্গু, কি উচ্ছ্বাস-ভরে,
ছুটিছে কল্লোলি' আজ প্লাবি' পারাপার!

সে চির-মিলন-আশা, দূর বনান্তরে,
মাধবী-বাসর-কুঞ্জ রচিছে আমার!
জাগিছে সে প্রেম-স্বপ্ন নব কলেবরে,—
তরল জ্যোৎস্নায় হেরি' তোমার আকার!

ঘুমায়ে পড়েছে দূরে জগৎ সংসার,—
পত্রে পুষ্পে সমাবৃত, মলয়-নিঃশ্বাসে!
বিমূঢ় হৃদয় ভাবে,— কোথা ভাষা তার!
কি দিয়া নবীন পিক বসন্তে সম্ভাষে?

জানি,— কি বলিতে চাই; জানিনা,— কি বলি
ক্ষম' এই অক্ষমতা; সত্যে নাহি ছলি।

শত নাগিনীর পাকে

শত নাগিনীর পাকে বাঁধ' বাহু দিয়া,
পাকে পাকে ভেঙে যাক এ মোর শরীর
এ রুদ্ধ-পঞ্জর হ'তে হৃদয় অধীর
পড়ুক ঝাঁপায়ে তব সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া!
হেরিয়া পূর্ণিমা শশী— টুটিয়া লুটিয়া
ক্ষুভিয়া প্লাবিয়া যথা সমুদ্র অস্থির ;
বসন্তে— বনান্তে যথা দুরন্ত সমীর
সারা ফুলবন দলি' নহে তৃপ্ত হিয়া।

এ দেহ— পাষাণ-ভার কর গো অন্তর!
হৃদয়-গোমুখী-মাঝে প্রেম-ভাগীরথী,
ক্ষুদ্র অন্ধ পরিসরে ভ্রমি' নিরন্তর
হতেছে বিকৃত ক্রমে, অপবিত্র অতি।
আলোকে পুলকে ঝরি', তুলি' কলস্বর
করুক তোমারে চির-স্নিগ্ধ-শুদ্ধমতি।

সন্ধ্যায়

স্নেহময়ী মাতা ওই দিবা-অবসানে,
চঞ্চল বালকে তাঁর, দুটি হাতে ধরি',
কত ছলে, কত বলে, কত স্নেহে, মরি,
পথ হ'তে ল'য়ে যান নিজ গৃহ পানে !
যায় শিশু— চায় পিছে কাতর নয়ানে—
কত সাধ, কত আশা, কত ধূলা পড়ি' !
বাধে পদ, উঠে দুঃখে কাঁদিয়া গুমরি'—
'মা গো, আর কিছুক্ষণ খেলি এইখানে !'

হা প্রকৃতি— জননী গো ! জীবন-সন্ধ্যায়
ওই মূঢ় শিশু সম, না বুঝে' তোমার
স্নেহ আকর্ষণে— ভাবি মরণ-তাড়না !
পলাইতে তোমা হ'তে পড়িয়া ধূলায়
আঁকড়িয়া ধরি বুকে ধূলার সংসার—
রোগ, শোক, হাহাকার, অভাব, লাঞ্ছনা !

নিত্যকৃষ্ণ বসু

হে নিত্য, অনিত্য সব— সকলি দু'দিন!
সেই প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-করুণ অন্তর,
দারিদ্র্যের মৃদু গর্বে চরিত্র সুন্দর,
স্বভাবে সরল অতি, কর্তব্যে প্রবীণ।
ধীর ভাষা, স্থির আশা, জ্ঞান সর্বাঙ্গীণ,
সংসারের সুখে দুখে সদা অকাতর;
জীবন-পাবন-যজ্ঞে মগ্ন নিরন্তর—
হৃদয়ে অজেয় বীর, বিশ্বে উদাসীন।

হে সুহৃদ, গেলে কোন মানসের তীরে
নবীন প্রভাতে লয়ে নব জাগরণ,
মাথায়ে দু'খানি পাখা পরাগে-শিশিরে,
বাঁধিয়া নয়নে স্বপ্ন, মুখে গুঞ্জরণ!
বাণীর চরণপদ্ম ঘিরে' ঘিরে' ঘিরে'
করিতে জীবন-গীত পূর্ণ সমাপন!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মরীচিকা

এসো, ছেড়ে এসো সখী, কুসুমশয়ন,
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।
কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশকুসুমবনে স্বপন চয়ন।

দেখো, ওই দূর হতে আসিছে ঝটিকা—
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।
দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপশিখা
দহিবে আঁধার নিদ্রা নির্মল অনলে।

চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে
সুখে দুঃখে যেথা সবে গাঁথিছে আলয়—
হাসি কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসারসংশয়রাত্রি রহিব নির্ভয়।

সুখরৌদ্রমরীচিকা নহে বাসস্থান,
মিলায় মিলায় বলি ভয়ে কাঁপে প্রাণ॥

কেন

কেন গো এমন স্বরে বাজে তবে বাঁশি,
মধুর সুন্দর রূপে কেঁদে ওঠে হিয়া,
রাঙা অধরের কোণে হেরি মধুহাসি
পুলকে যৌবন কেন উঠে বিকশিয়া !

কেন তনু বাহুডোরে ধরা দিতে চায়,
ধায় প্রাণ দুটি কালো আঁখির উদ্দেশে,
হায় যদি এত লজ্জা কথায় কথায়—
হায় যদি এত শ্রান্তি নিমেষে নিমেষে !

কেন কাছে ডাকে যদি মাঝে অন্তরাল,
কেন রে কাঁদায় প্রাণ সবই যদি ছায়া !
আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল,
এরই তরে এত তৃষ্ণা— এ কাহার মায়া !

মানবহৃদয় নিয়ে এত অবহেলা,
খেলা যদি— কেন হেন মর্মভেদী খেলা !

অক্ষমতা

এ যেন রে অভিশপ্ত প্রেতের পিপাসা—
সলিল রয়েছে পড়ে, শুধু দেহ নাই।
এ কেবল হৃদয়ের দুর্বল দুরাশা
সাধের বস্তুর মাঝে করে 'চাই চাই'।

দুটি চরণেতে বেঁধে ফুলের শৃঙ্খল
কেবল পথের পানে চেয়ে বসে থাকা!
মানবজীবন যেন সকলি নিষ্ফল—
বিশ্ব যেন চিত্রপট, আমি যেন আঁকা।

চিরদিন বুভুক্ষিত প্রাণহুতাশন
আমারে করিছে ছাই প্রতি পলে পলে।
মহত্ত্বের আশা শুধু ভারের মতন
আমারে ডুবায়ে দেয় জড়ত্বের তলে।

কোথা সংসারের কাজে জাগ্রত হৃদয়!
কোথা রে সাহস মোর অস্থিমজ্জাময়!



তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,
সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে
হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি,
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।

তবু মনে রেখো, যদি বড়ো কাছে থাকি,
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন,
দেখে না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি—
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।

তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস বিষাদ-ভরে কাটে সন্ধ্যাবেলা,
অথবা শারদ প্রাতে বাধা পড়ে কাজে,
অথবা বসন্তরাতে থেমে যায় খেলা।

তবু মনে রেখো, যদি মনে প'ড়ে আর
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

প্রাণের দান

অব্যক্তের অন্তঃপুরে উঠেছিলে জেগে—
তার পর হতে, তরু, কী ছেলেখেলায়
নিজেরে ঝরায়ে চল চলাহীন বেগে,
পাওয়া দেওয়া দুই তব হেলায়ফেলায়।

প্রাণের উৎসাহ নাহি পায় সীমা খুঁজি
মর্মরিত মাধুর্যের সৌরভসম্পদে।
মৃত্যুর উৎসাহ সেও অফুরন্ত বুঝি
জীবনের বিত্তনাশ করে পদে পদে।

আপনার সার্থকতা আপনার প্রতি
আনন্দিত ঔদাসীন্যে ; পাও কোন্ সুধা
রিক্ততায় ; পরিতাপহীন আত্মক্ষতি
মিটায় জীবনযজ্ঞে মরণের ক্ষুধা।

এমনি মৃত্যুর সাথে হোক মোর চেনা,
প্রাণেরে সহজে তার করিব খেলেনা।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

ঋষি

প্রশান্ত অন্তরে বসি, হে ঋষিপ্রবর,
অফুরন্ত ক্লান্তি-হীন উদ্যত উদ্যমে
কি ফুল্ল জ্ঞানের পুষ্প বিকশি' সুন্দর—
সে ফুলে অমৃত-পান করিছ সংযমে !

ভোগ-সুখ তুচ্ছ করি, নিত্য চিত্ত ভরি
অক্ষয় অমূল্য নিধি করিছ সঞ্চয়।
যে রত্ন যতনে তুলি' দিলে উপহরি ;
ধন্য তাহে জন্মভূমি। তুমি বিশ্বময়

ঘোষিলে দেশের খ্যাতি, আলোকি' কিরণে
অতীত বিস্মৃত তার গৌরব অমল।
ক্ষুদ্র এই স্তুতি-পুষ্প লবে কি চরণে ?
এ নহে সুরভি-স্নাত প্রফুল্ল কমল।

কৃপা করি উপহার লইলে বহিব
অসীম আনন্দ প্রাণে, চরণে নমিব।

কামিনী রায়

অশোক-সঙ্গীত - ১

কে সে বিজ্ঞ শোকার্তেরে হেন কথা বলে
মরের স্মৃতিতে বিনা আর কোন স্থানে
নহে অমরের বাস ? কি সান্ত্বনা মানে
তৃষিত, স্মরণ করি ভরা স্বচ্ছ জলে
সরোবর, মরে যবে তপ্ত মরুস্থলে,
শুষ্ক-কণ্ঠ ? বৃথা স্মৃতি কানে বহি আনে
ত্রিস্রোতার মত্তগীতি, দর্পে যবে চলে
বহি বরষার দান, গ্রীষ্ম-অবসানে।

হায়, ক্ষুদ্র স্মৃতিপট, তাহে অহরহ,
অনুক্ষণ করিতেছে কত রেখাপাত
প্রিয় কি অপ্রিয় কত ক্ষুদ্র ঘটনা-ই,
কত চিন্তা, কত তর্ক, ক্রন্দন, কলহ,
কত গূঢ় বেদনার ঘাত-প্রতিঘাত ;—
সেথাই মৃতের তরে অমৃতের ঠাঁই ?

অশোক-সঙ্গীত - ২

তব পাঠগৃহ-লগ্না চামেলীর লতা
প্রতিদিন ফুটাইছে ফুল নব নব,
মধুর সৌরভ-স্নাত, শুভ্র ও পেলব,
তাহার জীবনে নাই কোন ব্যাকুলতা,
অঙ্গে থাক ক্ষত চিহ্ন, ঢেকে রাখে ব্যথা
কাটিবার ছাঁটিবার, গৃহমাঝে তব
ছড়ায় সুরভি শ্বাস। আমি কবে হব
ব্যথায় নীরব নম্র, পুষ্পভার-নতা ?

প্রতিদিন দীপ্ত রবি ক্ষত প্রাণখানি
করিবে কিরণস্নাত ; বিনত এ শিরে
বহি যাবে বর্ষা বায়ু ; অমৃতের বাণী
কভু উচ্চৈঃস্বরে, কভু অতি ধীরে ধীরে
সুদূর সাগর হ'তে দিবে মোরে আনি,
আমিও আনন্দগন্ধ দিব ধরণীরে ?

প্রমথ চৌধুরী

জয়দেব

ললিত লবঙ্গলতা দুলায় পবনে।
বর্ণে গন্ধে মাখামাখি, বসন্তে অনঙ্গে।
নূপুর-ঝঙ্কারে আর গীতের তরঙ্গে,
ইন্দ্রিয় অবশ হয় তব কুঞ্জবনে॥

উন্মদ মদনরাগ জাগালে যৌবনে,
রতিমন্ত্রে কবিগুরু দীক্ষা দিলে বঙ্গে।
রণক্ষত-চিহ্ন তাই অবলার অঙ্গে
পৌরুষের পরিচয় আশ্লেষে চুম্বনে॥

পাণির চাতুরী হ'ল নীবীর মোচন।
বাণীর চাতুরী কান্ত কোমল বচন॥

আদিরসে দেশ ভাসে, অজয়ে জোয়ার!
ডাকো কল্কি, ম্লেচ্ছ আসে, করে করবাল,
ধূমকেতু কেতু সম উজ্জ্বল করাল,
বঙ্গভূমি পদে দলে তুরুস্ক সোয়ার!

রজনীগন্ধা

রাত্রি-হাতে সঁপে দেয় দিবা যবে সন্ধ্যা,
পরায়ে তাহার অঙ্গে গাঢ় লাল আলো,
নিশা যারে ক্রোড়ে ধরে দিয়া বাহু কালো—
সেই লগ্নে ফোটো তুমি, রে রজনীগন্ধা !

রাত্রির পরশে যবে পৃথ্বী হয় বন্ধ্যা,
না পারে ফুটাতে ফুল রূপে জম্‌কালো,
তুমি সেই অবসরে বুক খুলে ঢালো,
গোপনে সঞ্চিত গন্ধ, লো রজনীগন্ধা !

দিবসের প্রলোভনে তুমি নহ বশ্যা।
হৃদয় তোমার তাই অসূর্যম্পশ্যা ॥

আমার আসিবে যবে জীবনের সন্ধ্যা,
দিবসের আলো যবে ক্রমে হবে ঘোর,
কানেতে পশিবে নাকো পৃথিবীর সোর,—
মোর পাশে ফুটো তুমি, হে রজনীগন্ধা !

আত্মকথা

কবিতা আমার জানি, যেমন শঙ্কুর,
দু'দিনে সবাই যাবে বেবাক্ ভুলিয়ে !
কল্পনা রাখিনে আমি আকাশে তুলিয়ে,—
নহি কবি ধূমপায়ী, নলে ত্রিবঙ্কুর ॥

হৃদয়ে জন্মিলে মোর ভাবের অঙ্কুর,
ওঠে না তাহার ফুল শূন্যেতে দুলিয়ে।
প্রিয়া মোর নারী শুধু, থাকে না ঝুলিয়ে,
স্বর্গ-মর্ত্য-মাঝখানে, মত ত্রিশঙ্কুর !

নাহি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন,
আমার হৃদয় যাচে বাহুর বন্ধন ॥

কবিতার যত সব লাল-নীল ফুল,
মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই,
তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল,—
মনোঘুড়ি বুঁদ হ'লে ছাড়িনে লাটাই !

চেরিপুষ্প

বসন্তের আগমনে আজো আছে দেরি,
পর্বতের স্তরে স্তরে বিরাজে তুষার।
চুরি করে' ফিকে রঙ গোলাপী উষার,
লাজমুখে ফুটিয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে চেরি!
পত্রহীন শাখাগুলি ফেলিয়াছে ঘেরি,
বর্ষিয়া তাহার অঙ্গে কুঙ্কুম-আসার।
সে জানে, যে বোঝে অর্থ ফুলের ভাষার,
বসন্তের ঘোষণার তুমি রক্তভেরী!

মর্মর-কঠিন-শুভ্র-তুষারের গায়ে
পড়েছে রূপের তব রঙীন আলোক,
পূর্বরাগে লিপ্ত তব কর-পরশনে
শিশিরে বসন্ত-স্মৃতি তুলেছে জাগায়ে।
রক্তিম আভায় যেন ভরিয়া ত্রিলোক
শোভিছে উমার মুখ শিব-দরশনে।

ওঁ

তোমার নামেতে সবে মিছে কথা বলে,
সকলে জানিত্ব যদি তোমার স্বরূপ
কিছুই থাকিত নাকো এখন যেরূপ,—
তোমার নামেতে শুধু মিছে কথা চলে।

তোমারে খুঁজিয়া কেহ কোথাও না পায়,
বাহিরেতে নাহি মেলে তোমার দর্শন,
ভিতরেতে নাহি মেলে তোমার স্পর্শন,
শোনার অধিক জানা কেহই না চায়।

তোমার কাহিনী যত, সব রূপকথা,
তোমার ব্যাখ্যান করা জ্ঞানের মূর্খতা।

কেহই বলিতে নারে তুমি কেবা হও,
আলোকে থাকো না তুমি, না থাকো আঁধারে।
কেহই বলিতে নারে তুমি কিবা নও,—
সবেতে জড়িয়ে আছ ছায়ার আকারে॥

শশাঙ্কমোহন সেন

নির্ঝরিণী

চৌদিকে পর্বতশ্রেণী আকাশে উত্থিত,
শান্ত, স্থির যেন যোগনিদ্রা-নিমগন ;
মাঝখানে আক্রন্দিত, চির জাগরিত
ঝর ঝর ঝর ঝর— অসীম স্পন্দন !

চিরদিন টল টল, পাষাণ-তনয়া—
কভু কালী, কভু গোরী নাহি অবসাদ ;
জগতে বিলায়ে প্রাণ, বরাভয় দিয়া
কভু স্নেহময় গীত কভু অট্টনাদ।

বিপুল পাষাণরাশি নির্জীব, নিষ্ঠুর,
গরিমা-মহিমা-ময় ; হৃদয়ের তলে
সে পাষাণ দ্রব হয়ে তরল মধুর
অমৃতস্পর্ধিনী ধারা উথলিয়া চলে।

চির মরণের মাঝে জীবন সজাগ।
চির বৈরাগ্যের মাঝে চির অনুরাগ।

নিস্তব্ধতা

আঁধার রজনী আজ। বড়ই গভীর!
জগতের বক্ষ হতে বিশাল মহান
কি যেন বাহিরি আসি করিতেছে ধ্যান!
সভয় চরণে, ধীরে বহিছে সমীর!

শঙ্কিত হৃদয় মোর! আরো কাছে আয়—
আকাশ সঘন, সান্দ্র পরতে পরতে,
সীমাহীন, শব্দহীন মহাকাল হতে
ওই শোন অন্ধকারে ওকি শোনা যায়!

দেখিতেছি শুনিতেছি? বুঝিতে পারি না
শব্দ রূপ রস স্পর্শ সবি একাকার—
কোন দ্বারে পশিতেছে হৃদয়ে আমার
এই সৃজনের আদ্য বিরাট জল্পনা!

ওরে ক্ষুব্ধ প্রাণ মোর, টুটিয়া গলিয়া
এ মহাসাগরে বুঝি যাবে মিলাইয়া!

চিত্তরঞ্জন দাশ

দরিদ্র

অনেক সৌন্দর্য আছে হৃদয় ভরিয়া,
সহস্র মাণিক্য জ্বলে অন্তর-আঁধারে,
অনন্ত সঙ্গীতরাশি কাঁপিয়া কাঁপিয়া
দিবস-রজনী করে উন্মাদ আমারে!

গাহে পাখী, বহে বায়ু বসন্তের মত,
নানাবর্ণে শত পুষ্প ফুটে মনোবনে ;
জগতের কাছে তবু দরিদ্র সতত
মরমে মরিয়া থাকি আপনার মনে।

তোমরা ডেকেছ তাই আনিয়াছি আজ
ভাষায় গাঁথিয়া পুষ্প মন-মালঞ্চের ;
তোমরা দেখিছ শুধু বাহিরের সাজ,
সৌন্দর্য লুকায়ে আছে গৃহে অন্তরের।

হৃদয়-সম্পদ্‌রাশি ফুটে না ভাষায়,
বাহিরে আনিলে সব সৌন্দর্য হারায়।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুর্বিপাক

লক্ষ্মী উঠেছিলা, শুনি, মন্থনের পাকে
আদি যুগে দেবতার ঘরে ; কলিকালে
নারী আসি' ধরা দেয় কিসের বিপাকে
হতভাগ্য পুরুষের ছিন্ন ভাগ্যজালে,

তাই ভাবি মনে। কি বন্ধনে বেঁধে রাখে
অচঞ্চলা করি' এই চিরচঞ্চলারে
ক্ষুদ্র বক্ষমাঝে ! শূন্য বক্ষ দেয় তাকে
কি যে নিধি, মূঢ় জন বুঝিতে না পারে।

ভয় হয়, দেবতা ত করে নি ছলনা
কেহ নারীবেশ ধরি'। বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া
নেমে আসেনি ত কোন ত্রিদিব-অঙ্গনা
কুতূহল ভরে— শুধু কৌতুক লাগিয়া !

কি বলি' সম্ভাষি তারে, কোথা দেই ঠাঁই
আমি মুগ্ধ মাণবক ভাবিয়া না পাই।

প্রিয়ম্বদা দেবী

ব্যর্থ-চেষ্টা

শুধু চতুর্দশ পদে বাখানিতে চাই
যে প্রেমের অন্ত নাই নাহি যার শেষ,
প্রতি ছত্রে, প্রতি ছন্দে তাঁই বাধা পাই,
তাই কবিতার মোর হেন দীন বেশ।

এ যেন মুকুরতলে ব্রহ্মাণ্ডের ছায়া,
অসীমেরে টেনে আনা সীমার মাঝারে,
নিত্য নব রূপময়ী প্রকৃতির মায়া
গড়িয়া রাখিতে চাই মর্ম্মের আকারে।

সব পড়ে না'ক চোখে কত থেকে যায়,
চঞ্চল-জীবন-লীলা নাহি দেয় ধরা,
হাসিটি ফুটিলে, অশ্রু ফোটে না'ক হায়,
হেরি যদি নভস্থল, শ্যাম বসুন্ধরা

পড়ে থাকে বহুদূরে, নির্ঝর নিক্কণে—
সমুদ্রের বজ্রনাদ জাগে না স্মরণে।

মমতা

সে আমার শুভ্র নয় হিমানীর মত,
ওষ্ঠাধরে বিম্বফল্ লজ্জা নাহি পায়,
হেরি তার ভুরু দুটি ধনু করি নত
অনঙ্গ বিনম্র শির ফেরে না ধরায়।

আঁখি দুটি সকরুণ, ললাটফলকে
স্ফটিক নির্মল দীপ্তি করে না প্রকাশ,
নবোদ্ভিন্ন দন্তপংক্তি উজ্জ্বল ঝলকে
মহার্ঘ মুকুতা নাহি করে উপহাস।

আজো তার তনুখানি পুষ্পহীন লতা,
বনের শৈশবটুকু ধূলিতে মলিন,
কত ভুলে ভরা তার দু'চারিটি কথা,
আধ-শেখা গীত সম মাধুরীবিহীন।

শুধু সে আমার অতি আপনার ধন
এত দেখে শুনে তাই তৃপ্ত নহে মন।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

গান

শুধু আপনার তরে নহে গীতি গান,
সুরসাল ছন্দোবন্ধ। বিপুল বসুধা
আছে,— অগণ্য মানব ; মিটে নাই ক্ষুধা
কত দুঃস্থ হৃদয়ের! তারে কর দান

চিরপুঞ্জীকৃত সুধা ; সস্নেহ সঞ্চয়,—
মরম-মন্থন-করা, সঘন ঝঙ্কৃত,
একই সান্ত্বনাভরা, দিব্য অলঙ্কৃত ;
সুস্থ করিবারে পারে অশান্ত হৃদয়!

গান শুনে যদি সর্ব গ্লানি ঘুচে যায়,
রাহুমুক্ত পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র-প্রায়
মধুরিমা-বিকশিত, গর্বিত, সুন্দর,
জেগে উঠে যদি কোন করুণ অন্তর!—

একটি তৃষিত শ্রোতা যদি দেয় কান
জুড়াইয়া যাবে তপ্ত সঙ্গীতের প্রাণ।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

দেহ ও দেহাতীত

স্পন্দিত মর্মরে গড়া ওই তনু প্রিয়ে,
উদ্দাম-যৌবন-উর্মি-মুখর মোহন,
কোন্ সে নন্দন-বনে কোন্ সুধা পিয়ে
তরুণ দেবের নব বসন্ত-স্বপন !

ও যে মোর বহুভাগ্য ! তবু জাগে মনে,
জড় স্বতন্তর উহা চির অচেতন ;
মহাব্যবধান ও যে মোদের মিলনে।
কেমনে কাটাই ঘোর দেহের বন্ধন !

মিলন-পরশমণি পরশের মোহে
দুই মনে জাগে এক সুখের স্বপন ;
সে যে তুমি, সে যে আমি, সে যে মোরা দোঁহে,
দোঁহার মাঝারে দুঁহু সম্পূর্ণ মগন ;

কে পুরুষ কেবা নারী ক্ষণে হয় ভুল,
প্রাণ কোথা ভাসি যায় ছাড়ি দেহকূল।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

কানে কানে

হের, সখি, আঁখি ভরি' শুভ্র নীরবতা,
পাহাড়ের দুটি পার্শ্ব, জ্যোৎস্না আর মসী।
নিথর নিশার কণ্ঠে কি দিব্য বারতা,
কান পেতে শোন' হেথা বালুতটে বসি'।

নীরবে নদীর জল চলে সাবধানে,
সুর মিলাইয়ে ওই তারকার সাথে।
পথ চেয়ে চেয়ে বায়ু, মগ্ন কার ধ্যানে—
সন্তর্পণে হাতখানি রাখ মোর হাতে।

যাদুকর চন্দ্র-কর তালের বাকলে—
হেথা-হোথা তুলিয়াছে রূপার ফলক;
মাধবী-লতার ফাঁকে বকুলের তলে
কে তরুণী মুঠি ভরি' ধরে চন্দ্রালোক!

পাখী লুকায়েছে আঁখি পালক-শিথানে,—
আজিকার কথা বঁধু কহ কানে কানে!

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বিপন্না

কৌরবের সভাতলে বামহস্তে বসন সম্বরি'
অন্য বাহু উর্ধ্বে তুলি' শ্রীহরিরে ডাকি' বারম্বার,
বিহ্বলা দ্রৌপদী যবে দুটি চক্ষু অশ্রুজলে ভরি'
ঘৃণায় লজ্জায় ক্ষোভে মেগেছিল মৃত্যু আপনার ;—

শ্রীকৃষ্ণ তখনো সেই অপূর্ণ নির্ভর হেরি' তার,
আপনারে একেবারে বস্ত্ররূপে দেয়নি বিতরি' ;
কিন্তু যবে নিরুপায়, দুই বাহু মেলিয়া উদার,
চাহিল শরণ শেষে— নিমেষে আসিলা নামি' হরি।

বিমূঢ় পাণ্ডবদল পরস্পরে চাহি' রহে মুখে,
ধর্ষিতার হর্ষ হেরি' দুঃশাসন গুমরায় দুখে !

বিপন্না দ্রৌপদী আজি ঘরে-ঘরে মেলি' দুই বাহু
কাঁদে যে তোমায় ডাকি' ; কোথা তুমি লজ্জানিবারণ ?
তুচ্ছ করি' ভর্তৃদলে , ব্যর্থ করি দুঃশাসন রাহু—
এস তুমি আর্ত-সখা— এ দুর্দিনে, এস নারায়ণ।

সতীশচন্দ্র রায়

চাঁদ

আরো মনোহর তুই, চন্দ্রমা উজলা।
ধরার অঞ্চল-ঢাকা অভিসার-দীপ,
রজনীর কুঞ্জবনে রস-বিহ্বলা
যখন মিলনে যায়, কুরুবকনীপ

হেলায় ছড়ায়ে পথে। ইন্দ্রজালে তোর
শত-যতনের কাজ শ্লথ করে ছাড়ি'
আধেক ধরণী উঠে হইয়া বিভোর—
মেদুর মদির প্রাণে। খেয়া দিয়া পাড়ি,

সংসারের তট হতে স্বপনের তটে
পহুঁছি জাগিয়া উঠে— জলে কুলু স্থর,
জাগি উঠে' জাগে স্বপ্ন মেঘমালা পটে,
পরাণ হইয়া উঠে আপনি বিধুর।

রবি আনে জাগরণ প্রদীপ্ত প্রখর,
তুমি আনো স্বপ্নলোকে বিধুর জাগর।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

‘স্বর্গাদপি গরীয়সী’

বঙ্গভূমি ! কেন মা’গো হইলে উর্বরা ?
তাই, মা, নয়ন-ধারি ফুরা’ল না তোর ;
স্বর্গ হ’তে গরীয়সী জন্মভূমি মোর,
এ স্বর্গে দেবতা কই ? দেখায়ে দে ত্বরা ।

বল্ মোরে, কোন্ হেতু, সুপ্ত আজি তা’রা ?
অথবা, মগন কোনো তপস্যায় ঘোর ?
কবে ধ্যান ভাঙিবে গো,—নিশি হ’বে ভোর ?
কবে, মা, ঘুচিবে তোর নয়নের ধারা ?

অসুরে ঘিরেছে, হায়, কল্প-তরুবরে,
দেবতার কামধেনু দানবে দুহি’ছে !
আজি হ’তে অন্বেষি’, ফিরিব ঘরে, ঘরে,
কোথা ইন্দ্র ?— ব’লে দেগো, কাঁদিস্‌নে মিছে ।

সে যে তোরে অস্থি দিয়ে গ’ড়ে দিবে অসি ;
অয়ি বঙ্গ ! অয়ি স্বর্গ ! অয়ি গরীয়সী !

সন্ধির আনন্দ

কমল, গোলাপ আন ভরিয়া অঞ্জলি,
আন বেলা, ফুল্লযূথী ছড়াও পবনে ;
আমার ব্যথায় যারা ব্যথা পেলে মনে,—
এস আজ ! আনন্দের অংশী হ'তে বলি ।
আন গো অরুণ ফুল, আন শুভ্র কলি,
যে ফুল সাজিবে ভাল এ আনন্দদিনে ;
সুগন্ধ সলিল-ধারা ঢাল গো ভবনে,
আমার ভাবের সাথে মিলে এ সকলি।

শান্ত সে বিপক্ষ মোর, করেছে মার্জনা,
শান্তি এবে, চাহে না সে মরণ আমার ;
দয়া মাত্র গর্ব তার,— নহে নহে ঘৃণা ;
আশ্চর্য হ'য়ো না তবে উৎসাহে আমার ;
এত সুখে— এ আনন্দে— ক্ষীণ মনোবীণা—
নহে ছিন্নতন্ত্রী !— এই বিস্ময় অপার !

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

অপূর্ণ

মাগিতেছে পূর্ণাহুতি দীপ্ত হোমানল,
কোথায় ঋত্বিক ? ধরা করিতেছে খেদ,
কোন্ ইন্দ্র হ'রে নিল তুরগ-চঞ্চল,
অপূর্ণ রহিয়া গেল মহা-অশ্বমেধ ।

কোন্ অবিশ্বাসী দিল মুক্ত করি ধার
অর্ধ-গড়া মূর্তি হ'ল বিশ্বকর্মা চুপ,
দেবতা-গঠন সাঙ্গ হ'ল নাকো আর,
অসমাপ্ত র'য়ে গেল অফুরন্ত রূপ ।

অর্ধ-লেখা কাব্য রাখি' চলে গেল কবি,
প্রেম গেল স্মৃতি রাখি' হৃদি-কোকনদে,
বনে গেল শিল্পী রাখি' অসমাপ্ত ছবি,
পূর্ণতা গুমরি' কাঁদে অপূর্ণের পদে ।

শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ বৃত্ত-রেখা ক্ষীণ
আলোকের আবছায়ে হয়ে থাকে লীন ॥

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

উৎকণ্ঠা

কর্ষিত হয়েছে ভূমি, এল সুসময়,
সু-বীজ-বপনকারী কৃষাণ কোথায় ?
নিশি দিন কেঁদে মরে ব্যাকুল হৃদয়,
কত কাল যাবে আর বৃথা প্রতীক্ষায় ?

কোন্ শুভ ঊষা-ক্ষণে নিঃশব্দ চরণে
তুমি আসি দিবে দেখা হে চাষী সুন্দর !
চেয়ে আছি অনিমেষ বিনিদ্র নয়নে
সারা পথে বিছাইয়ে সকল অন্তর !

কোন্ সে অদৃশ্য রাজ্যে বসতি তোমার
প্রিয়তম ; প্রাণাধার, কে দিবে সন্ধান ?
কভু দূরে শুনি তব মুরলী-ঝঙ্কার
বাহিরিয়া যেতে চায় উন্মত্ত পরাণ !

হে কৃষক প্রেমময় ! প্রতি পলে আজ
তোমারি বিচ্ছেদে হানে যুগান্তের বাজ !

অভিমান

আমারে তোমার বলি' কহ প্রিয়তম,
তবে কেন বিশ্ব-জনে বিলাইতে চাও ?—
এ কি প্রণয়ের রীতি ওগো নিরমম,
মরমে প্রদানি ব্যথা সুখ কিবা পাও ?

তুমি জান কত যত্নে, কত সংগোপনে
লুকাইয়া রেখেছিনু যে হৃদি-ভাণ্ডার,
মুক্ত করি দিনু তাহা তোমারি কারণে
মিটাইতে যুগ-ব্যাপী-পিপাসা তোমার !

আজি কেন মোর সনে এ নিষ্ঠুর খেলা,
প্রাণ দিয়ে আমি তোমা করিনি গ্রহণ ;—
যখন করিল দগ্ধ সংসারের হেলা
অঞ্চলে মুছায়ে তব দেই নি নয়ন ?

হা নাথ ! রহস্য রাখ ! কহ একবার
তুমি মম, আমি শুধু সঙ্গিনী তোমার।

কান্তিচন্দ্র ঘোষ

চিরন্তনী

সে যে জেগেছিল মোর বাঁশরীর সুরে,
আমার নয়নপাতে ফুটেছিল রূপে।
পরশে সঙ্কোচ ছিল, কথা চুপে চুপে,
দৃষ্টি ছিল কল্পলোকে কোথায় সুদূরে।

সেই রজনীটি মোর এই মর্ত্যপুরে
পরিশ্রান্ত মিলনের তীব্র গন্ধধূপে
মিশিল আজিকে কোথা— স্মৃতি-অন্ধকূপে
হারানু কবে না জানি ক্ষণিকা বধূরে।

মুহূর্তের জ্বালা শুধু; যে গিয়াছে যাক
অতীতের বাঁধা বীণা রহুক নির্বাক।

আমার মানস-কুঞ্জে আমি জানি তবু
ব্যর্থ হয় নাই সেই অভিসার-রাতি;
মানসী প্রিয়া সে মোর ভোলে নাই কভু,
জ্বালিয়া রেখেছে চিরমিলনের বাতি॥

মোহিতলাল মজুমদার

উপমা

মৃত্যুর বরণ নীল,— শুনেছিনু কবে সে কোথায় !
যমুনার জল, না সে প্রাবৃটের নবঘনশ্যাম ?
অথবা গরল-দ্যুতি হর-কণ্ঠে নয়নাভিরাম ?
উমার কপোল-শোভী সে কি নীল অলকের প্রায় ?
অতিদূর কূলে যথা তালীবন-রেখা দেখা যায়—
নিবিড় আয়স-নীল !— তেমনি সে আঁখির আরাম ?
কিম্বা সে কি দিক্‌প্রান্তে আচম্বিত বিদ্যুতের দাম,
ভীষণ নিঃশব্দ নীল ?— পরে সে অশনি গরজায় !

উপমা মনেরই খেলা ; প্রাণ বুঝে উপমা-বিহনে,
সে যে নীল— নহে রক্ত, পীত, কিম্বা ধূমল, ধূসর ;
নীলাকাশতলে যথা সিন্ধুজল নীল নিরন্তর—
তেমনি মৃত্যুর ছায়া চেতনার অগম-গহনে !
সে নহে যমুনা-জল, নব-ঘন অথবা গগনে,—
মহাশূন্য !— তাই নীল, নীল যথা অসীম অম্বর ।

বিদায়

আজ, সখি, সাঙ্গ হ'ল আমাদের মিলন-বাসর ;
বাদলের কৃষ্ণা তিথি,— আর্দ্র বায়ু উঠিতেছি শ্বসি',
লুকায় মেঘের আড়ে পলাতক শীর্ণ ম্লান শশী,
তোমারও কাঁপিছে হিয়া, ওই বুঝি কাঁপিছে বেসর !
চুরি করে' এসেছিনু, ভেটিবার নাহি অবসর—
জানো সে করুণ কথা, অয়ি মোর দুঃখের প্রেয়সী !
এবার সাজানু তোরে তাপসিনী ছন্দ-চতুর্দশী,
বিনা-ফুলে বিনাইয়া দিনু তোর কুন্তল ধূসর !

যদি পুনঃ দেখা হয় চন্দ্রকান্ত চৈত্র-রজনীতে,
ফুলে ফুলে ভরি' দিব ফাগে-রাঙা বাসন্তী দুকূল,
গা'ব গান প্রাণ-ভরা, দুলি' দোঁহে স্বপ্ন-তরণীতে !
আজ জ্যোৎস্না ম্লান সখি, সুপ্ত অলি, মুদিত মুকুল—
ওই যে ডাকিছে পাখী সারারাত কাতর-সঙ্গীতে,
ওরি সুরে রয়ে গেল এবারের রসনা ব্যাকুল !

শ্রাবণ-শর্বরী

আজ রাতে রুদ্ধ কর সব ওই দ্বার-বাতায়ন,
কাঁদিছে আঁধার ধরা বায়ুশ্বাসে মেঘ-গরজনে ;
দামিনী ঝলকে মুহু, অবিশ্রান্ত ধারা-বরিষণে
ঝাপটে ভিজিয়া গেল বার বার শিথান-শয়ন !
প্রদীপের তলে বসি'— যূথী যেই করেছ চয়ন
গাঁথো তারে চিকনিয়া, আমি পড়ি পুঁথি মনে মনে—
বিরহের শ্লোক যত, আর মুখ হেরি ক্ষণে ক্ষণে—
কুসুমের 'পরে ন্যস্ত ওই দুটি ভ্রমর-নয়ন !

কত আঁখি অশ্রুজলে ভরিয়াছে শ্রাবণ-শর্বরী—
প্রিয়াহারা বিরহী সে, বারিধারা হৃদয়-বিধুর !
কত রাধা বায়ুরবে শুনিয়াছে শ্যামের বাঁশরী,
নিশীথের নীলাঞ্জনে আঁকিয়াছে বদন বঁধুর !
আজি সে কাহিনী মোর নয়নের নিদ্ লবে হরি',
বিরহ-কল্পনা-সুখে হ'বে এই মিলন মধুর !

বন-ভোজন

দিবা-বধূ পরিয়াছে বাকলের শাড়ী, কড়িহার ;
আর্দ্রচুল এলো করি' খুলিয়াছে বিপুল কবরী—
তপন-প্রেয়সী আজ সাজিয়াছে মলিনা শবরী,
সিঁদুর মুছিয়া পরে কালাগুরু ললাটে তাহার !
আজ কাননের ভোজ, তারি হাতে করিবে আহার
যত বৃদ্ধ বনস্পতি ; তাই যত্নে অঞ্চল সম্বরি'
কটিতটে, সুবৃহৎ থালিকায় পায়সাম্বু ভরি',
ফিরিছে নিকটে দূরে, গুণ্ঠন খসিছে বার-বার ।

হেরিতেছি সেই শোভা— ধরণীর সে বন-ভোজন !
নিদাঘার্ত তরুরাজি, উপবাসে বিশীর্ণ মলিন—
কি হাসি বিকাশে মুখে, হেরিয়া পারণ-আয়োজন
পল্লবে পল্লবে স্নিগ্ধ মেঘালোক কি বর্ণে বিলীন !
হরিত, ঈষৎ-পীত, কারো দেহ গাঢ় নীলাঞ্জন—
পিয়িছে শ্যামল-সুধা আঁখি মুদি', বিরাম-বিহীন !

কালিদাস রায়

তৃষ্ণা

একটি যুগের তব আয়োজন প্রিয়া
সহস্র যুগের মোর চিত্তব্যাকুলতা।
ছুটি মাত্র শ্রুতি তব, একখানি হিয়া,
বহু বরষের মোর বুকভরা ব্যথা।

অজস্র চকোর মোর হৃদয় গগনে
দ্বাদশীর চাঁদ তব কতটুকু সুধা ?
একটি থালায় অন্ন, তোমার ভবনে
সুদীর্ঘ-ছুর্ভিক্ষ-ইদ্ধ মোর তীব্র ক্ষুধা।

একটি সরোজ মাত্র তব সরোবরে
শত লক্ষ অলি মোর অক্ষি-তারকায়।
শত নিদাঘের জ্বালা মোর বক্ষ ভরে
ক'টি বিন্দু করুণায় কি বা হবে হায় ?

তব রূপ-সিন্ধু হেরি ব্যাপি দশ দিশা
তাতেই বা কিবা ? মোর অগস্ত্যের তৃষা।

সুশীলকুমার দে

সনেট - ১

এ নহে গো আষাঢ়ের প্রথম দিবস
শিপ্রাতীরে যূথীবনে কুসুমচয়ন,
মুগ্ধ জনপদবধূ-স্নিগ্ধ-বিলোকন,
বিদ্যুৎস্ফুরণ-কান্তি কনক-নিকষ !
এ ভরা ভাদর-দিন বাদরে অবশ,
বিরাট দুঃখের ছায়া মেঘের মতন,
বাষ্পাকুল সারা হিয়া, প্রান্তর কানন,
নিঃশ্বাসে ভাসিছে আর্দ্র শীতল পরশ !

ঢাকে হৃদয়ের সীমা নয়নের নীরে
স্মিরিতি-জড়িত দূর দিগন্তের রেখা ;
প্রেমের সুবর্ণকান্তি নিভে ঘুরে' ফিরে,—
মুঁছে আসে কল্পনার নিরালোক-লেখা ;
কালিমার ছায়া ভাসে জীবনের তীরে,—
আমি বড় একা আজ আমি বড় একা !

সনেট - ২

সমগ্র জীবন হ'তে একটি নিমেষ
তুমি মোরে দাও শুধু ; কত রাত্রি দিন
অনন্ত কালের স্রোত বিরাম-বিহীন—
তা'র মাঝখানে শুধু মুহূর্তের লেশ,
শুধু একবিন্দু সুধা— মন্থনের শেষ !
একটি সে পলকের অনুপথ-লীন
জীবনের আলোকের রশ্মি সীমাহীন,—
শিশিরের বিন্দু-কেন্দ্রে সূর্যের আবেশ ;

যে-পলকে ফুটে' ওঠে সমগ্র জীবন
একটি ফুলের মত সহজ সুন্দর,—
মুকুলের প্রয়াসের পূর্ণ সমাপন ;
একটি সুরের মাঝে উচ্ছ্বসি' যেমন
কেঁপে' ওঠে অন্তহীন ভাবের গুঞ্জর ;
বিন্দু-অশ্রু-মাঝে যেন অনন্ত বেদন !

পরিমলকুমার ঘোষ

চোখের মোহ

বুঝিতে পার না সখি, কেন মুখপানে
নীরবে চাহিয়া থাকি পলকবিহীন ?
কোন্ সে রহস্য মাঝে কিসের ধেয়ানে
মুগ্ধ এই আঁখি দুটি রহে গো বিলীন ?

তুমি কি ভাবিছ মনে ও মুরতি-মাঝে
আমি শুধু হেরিতেছি রমণী তোমায় ?
শুধু মৌন কামনার ব্যথা প্রাণে বাজে !
তাই শুধু চেয়ে থাকি আকুল তৃষায় ?

তুমি কি বুঝিবে নারি ! ওই আঁখি দিয়া
কি কথা কয়েছ চুপে পরাণে আমার।
কোন্ সে অমৃতলোকে জেগেছে এ হিয়া,
কোন্ স্বপ্ন-অমরার নন্দন-মাঝার !

আঁখিতে স্বপন ভরি খুঁজি তোমা তাই,
তোমারি মাঝারে পুনঃ তোমারে হারাই।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

অজানার আয়োজন

এই যে কুসুম-ফোটা আলো-ছায়া-ভরা
আকুল-বাতাস-ঘেরা জীবন-উদ্যান ;
এই যে প্রাসাদখানি আশা-ভিতে গড়া
মাণিক-মুকুতা-গাঁথা উচ্চ মহীয়ান ;

এই যে বিপুল সৌম্য হৃদয়-সম্রাট
মরমের সিংহাসনে আপনা বিকাশি' ;
এই যে বুকের মাঝে বন্দন বিরাট
শত ছন্দ-গাথা লয়ে উঠিছে উল্লাসি' ;

কার তরে ?— কার তরে মৌন আয়োজন,
বিপুল-যতনে-গড়া দানেরই সম্ভার ?
মৃত্যু ? মৃত্যু সে কি এত প্রিয় জন
তারি হাতে তুলে দিব এ অমৃত-ধার

প্রাণ-পাত্র-ভরা ? এ মন্দির গরীয়ান
মরণ-চরণে টুটি' লবে অবসান ?

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বিপ্রলব্ধা

শারদ জ্যোৎস্নার মুখে পড়িয়াছে রাত্রি-শেষ ছায়া,
উৎসারিত আলোকের শেষ রশ্মি জ্বলে আঁখিকোণে,
শ্যাম-সমারোহে গাঢ় ছল ছল জলভরা মায়া,
ইন্দ্রধনু ফুটাইল ভ্রূভঙ্গিমা কখন গোপনে।

মূক যুগান্তের কথা নয়নে মিনতি হয়ে ফুটে,
ব্যথার কুণ্ঠিত বাণী অধরোষ্ঠে আধ-বিকম্পিত,
স্মরণ-পথের প্রান্তে ধূলিলিপ্ত জীর্ণ পর্ণপুটে,
মঞ্জরিত বসন্তের স্তব্ধ গান হতেছে ধ্বনিত।

তাহারে ঘিরিয়া মোর স্বপ্নসৌধ করেছি রচনা,
অনামিকা প্রিয়া মোর, উৎকীর্ণ সে স্মৃতির ফলকে,
মর্মের গেহিনী হয়ে সংসারে যে করিল বঞ্চনা
আমার অর্ঘ্যের ফুল সে কেমনে পরিল অলকে ?

বিপ্রলব্ধা সে আমার নিরুদ্দেশে তার অভিসার
অবলুপ্ত পদচিহ্ন আমারে টানিছে অনিবার।

সজনীকান্ত দাস

নবায়ন

অন্ধতার আবরণ বিদূরি বিজ্ঞান-শলাকায়
সুনিপুণ হস্ত যাঁর প্রকাশিল নব সূর্যালোক—
লভি নয়নের জ্যোতি তাঁর প্রতি নতি মোর ধায়,
অবারিত দৃষ্টি মোর দিনে দিনে দূরগামী হোক।
তমসা-আচ্ছন্ন আঁখি যা দেখেছে কটু ও কষায়
চারিদিকে যে দেখিয়া ভেবেছিনু অন্ধ হোক চোখ,
নবীন দর্শন লভি চিত্ত মোর' প্রার্থনা জানায়—
সুন্দর হউক ধরা মানুষেরা হোক বীতশোক।

বহুদিন ভুলেছিনু পৃথিবীতে এত আছে আলো,
যত আলো এ আকাশে এ মাটিতে তত ভালবাসা—
জড়ত্বের আবরণ মানুষেরে দেবত্ব ভুলালো,
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় ঘুচুক এ তম সর্বনাশা।
দরদী বিজ্ঞানী এসো, এ আঁধারে দৃষ্টি-দীপ জ্বালো,
আনন্দে হাসুক পৃথ্বী, দূর হোক নিস্ফল হতাশা॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

অপচয়

প্রেয়সী, আছে কি মনে সে-প্রথম বাঙ্ময় রজনী,
ফেনিল মদিরা-মত্ত জনতার উদ্দাম উল্লাস,
বাঁশির বর্বর কান্না, মৃদঙ্গের আদিম উচ্ছ্বাস,
অন্তরের অন্ধকারে অনঙ্গের লঘু পদধ্বনি ?

আছে কি স্মরণে, সখী, উৎসবের উগ্র উন্মাদনা,
করদ্বয়ে পরিপ্লুতি, চারিচক্ষে প্রগল্ভ বিস্ময়,
শূন্য পথে দুটি যাত্রী, সহসা লজ্জার পরাজয়,
প্রতিজ্ঞার বহুলতা, আশ্লেষের যুগ্ম প্রবর্তনা ?

সে-শুদ্ধ চৈতন্য, হায়, বৃথাতর্কে আজি দিশাহারা,
বন্ধ্য স্পর্শে পরিণত স্বপ্নপ্রসূ সে-গাঢ় চুম্বন ;
ভ্রাম্যমাণ আলেয়ারে ভেবেছিল বুঝি ধ্রুবতারা,
অকূল পাথারে তাই মগ্নতরী আমার যৌবন ॥

মরে না দুরাশা তবু ; মনে হয় এ-নিঃস্ব জগতে
এতখানি অপচয় ঘটাবে না বিধি কোনও মতে ॥

জিজ্ঞাসা

দিলেম বিমুক্ত ক'রে পিষ্টপুষ্প নিকুঞ্জের দ্বার,
অমোঘ প্রয়াণে তার রাখিব না মিনতির বাধা ;
কব না উদাস কণ্ঠে জীবনের যথার্থ সমাধা
যৌবনমধ্যাহ্নে আজি অকাতর বিস্মরণে তার ॥

বার্ষিক প্রতিজ্ঞা তার ধ্রুবতার মরীচিকা আঁকে
বিচ্ছেদবিধুর লগ্নে পরস্পর যাত্রীর নয়ানে ;
জানি অলজ্জিত রাতে, শ্লথনীবি, কম্প্র আত্মদানে,
দেয়নি সে মোরে অর্ঘ্য, খুঁজেছিল বসন্তসখাকে ॥

তবুও জিজ্ঞাসা জাগে, নিরুত্তর শূন্যেরে শুধাই
যে-অবেদ্য অভিজ্ঞান, চমৎকৃত যে-অনুকম্পন
বুলাল অমৃতযোগে চারি চক্ষে পরম চেতন,
সে কি মাত্র উপপাত, মূলে তার কোনও অর্থ নাই ?

সে-জাদু ছিল কি শুধু ফাল্গুনের অত্যুগ্র মাতনে,
অভিরাম গ্রীবাভঙ্গে, উরোজের অনবগুণ্ঠনে ?

কঞ্চুকী

নাটকী নায়ক-রূপে আজীবন দেখেছি নিজেকে ;
ভেবেছি আমার সঙ্গে অদৃষ্টের দ্বৈরথ-সমর ;
মর্ত্যের প্রতিভূ আমি, প্রতিপক্ষ সন্ত্রস্ত অমর,
কাজেই নিস্তার নেই পরিণামী সর্বনাশ থেকে ;

তবু যবনিকাপাত দেবে গ্লানি পরাজয় ঢেকে ;
প্রতিলোম অভিযানে লোকযাত্রা হবে অগ্রসর,
আমাকে হৃৎপদ্মে ধ'রে ; ব্যর্থ বীর্যে যীশুর দোসর,
আমি যাব আত্মৌপম্য সমাহিত সন্ততিতে রেখে ॥

উপস্থিত পঞ্চমাংক : প্রাক্‌নির্বাণ দীপের উল্লাসে
সমবেত পাত্র-পাত্রী করে স্ব স্ব বিধিলিপিপাঠ ;
নেপথ্যে আমার স্থান ; অন্ধকারে অধিকারী হাসে ;
সে-রঙ্গরসিক ব'লে, আমি ভ্রান্তিবিলাসে সম্রাট ॥

কদাচ দৈবাৎ যদি বাস্তবিক ভূমিকায়ও ঢুকি,
কামাখ্যার ষড়যন্ত্রে সাজি তবে ঘুমন্ত কঞ্চুকী ॥

মহাসত্য

অসম্ভব, প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ ;
অসঙ্গত চির প্রেম ; সংবরণ অসাধ্য, অন্যায় ;
বন্ধদ্বার অন্ধকারে প্রেতের সন্তপ্ত সঞ্চরণ
সাঙ্গ করে ভাগীরথী অকস্মাৎ বসন্তবন্যায় ॥

সে-মিলন অনবদ্য, এ-বিরহ অনির্বচনীয়
ধ্বংসসার স্বপ্নস্তূপে অচিরাৎ হারাবে স্বরূপ ;
আশা আজি প্রবঞ্চনা ; দিব না স্মারক অঙ্গুরীয় ;
ব্যবধি ব্যাপক জেনে, অঙ্গীকার নির্বোধ বিদ্রূপ ॥

তবু রবে অন্তঃশীল স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যের তলে
হিতবুদ্ধিহন্তারক ক্ষণিকের এ-আত্মবিস্মৃতি ;
তোমারই বিমূর্ত প্রশ্ন জীবনের নিশীথ-বিরলে
প্রমাণিবে মূল্যহীন আজন্মের সঞ্চিত সুকৃতি ॥

মৃত্যুর পাথেয় দিতে কানাকড়ি মিলিবে না যবে,
রূপান্ধ যুবার ভ্রান্তি সেই দিন মহাসত্য হবে ॥

প্রমথনাথ বিশী

আমি ভালবাসি সখী

আমি ভালবাসি সখী স্তব্ধ ফেনিলতা
মুক্ত কুন্তলের তব পড়ে যবে ঝরি !
তারো চেয়ে ভালবাসি তন্বী বেণীলতা
মহুয়া-মদির তব গ্রীবাটি আবরি।

আমি ভালবাসি সখী আলস্য-রভসে
ভাবনা-মন্থর তব ভাবুক-চরণ,
তারো চেয়ে ভালবাসি অবকাশ-রসে
অসম্বৃত অঞ্চলের মত্ত বিচরণ।

আমি ভালবাসি সখী, স্বপ্ন-লঘু-রবে
শুক্তি-শুভ্র হাসিটুকু অধরে তোমার ;
তারো চেয়ে ভালবাসি সেই হাস্য যবে
চকিত ময়ূর করে কলাপ বিস্তার।

আমি ভালবাসি সখী তোমার ও তনু,
তারো চেয়ে ভালবাসি যা তব অতনু ॥

স্বপ্নদাস

স্ফটিক-মন্দির আমি গড়েছি মোহের।
নিরঞ্জন শুভ্র হেথা দীন ভৃত্যসম
প্রাচীরে প্রাচীরে রচে কি বিচিত্রতম
সৌন্দর্যের ইন্দ্রধনু লক্ষ বরণের।
স্ফটিক-মন্দির আমি গড়েছি মোহের।
অশ্রুর ত্রিশিরা-কাচে জীবনের তাপ
আকাশে ছড়ায় কার প্রগল্‌ভ কলাপ,
স্বপ্নে-দেখা ছবি সে যে কোন্ নন্দনের।

স্বপ্নের নহিকো ভৃত্য, সে আমার দাস।
অদম্য গরুড়ে তাই হয়েছি উধাও
সুধাব্রতে, অসম্ভব চন্দ্রলোক পানে।
তোমরা স্বপ্নের ভৃত্য— তাই এত ত্রাস,
কখনো তাহার দৃষ্টি এড়াবারে চাও
কভু স্তুতি করো তারে— কবিতায়, গানে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রেম

কী করে দেখাবো প্রেম, যদি দেহ রহে নিরুত্তর
শাণিত শোণিতে যদি নাহি পায় উষ্ণ উন্মাদনা,
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালে নহে যদি আচ্ছন্ন প্রহর,
তবু প্রেম ? প্রেম নহে কায়াহীন কথার ছলনা।

আমার এ প্রেম, সখী, কামনা সে নিরবগুণ্ঠনা,
উদ্বেলিত উদধির ফেনিল রুধির, মোর গান
দেহের দুর্দান্ত দাহ, অস্থিময় অস্তিত্ব-চেতনা
আমার শরীরে সখী, সীমাহীন প্রেমের প্রমাণ।

প্রেম নহে ভাবপদ্ম, প্রেম শুধু আমার শরীর ;
আমি তার বিত্রপহা, মর্ত্যরূপ, আমি তার চিতা ;
আমার শরীরে সখী, মুহুর্মুহু মদির নদীর
তরঙ্গসঙ্ঘাত-তীক্ষ্ণ বেগময় উলঙ্গ শুচিতা।

দেহেরে নিরুদ্ধ করি এ-প্রেমের কোথা পাই ভাষা ?
কী করে বোঝাবো তারে ? দেহে তার প্রকাশ-পিপাসা।

অন্নদাশঙ্কর রায়

বিরহ

বিরহ মৃত্যুর মতো— এই শুধু ভেদ
মরণ মুহূর্তজীবী, বিরহ অমর।
মিলনের সনে তার অনন্ত সমর
কবিরা রচিছে বসি' উভয়ের বেদ।
বিরহ মৃত্যুর মতো— ভেদ শুধু এই
মরণের চিতানল সহজনির্বাণ,
নিরাশার শ্বাস লেগে চির কম্পমান
বিরহের দীপশিখা, তবু যে কে সেই।

বিরহ মৃত্যুর মতো। বিরহেরে চিনি।
চিনি বলে মনে হয়— সে সময় হলে
সুদীর্ঘ সাধনা মোর যাবে না বিফল,
মরণ সহন হবে। শুধু হে সঙ্গিনী,
একটি পুরানো কথা ফুরাবে না বলে
আর বার বলিবার কবে পাব ছল!

অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মন

স্থির স্নায়ুপথে ডাকো, বাহ্য স্নায়ু থাক্ পড়ে পিছু,
অভয় আত্মার সাথে যোগাযোগ কর তব গানে ;
তুমি যদি দূরে থাকো পারি নাক হেরিবারে কিছু,
তোমারি করুণা বিনা কিছু নাহি শুনি মোর কানে
হে মোর পরম প্রজ্ঞা ! মহাশক্তি সাধনার ভূমি
অনন্ত কালের বুকে প্রেমানন্দে করিয়াছ দান।
কর্মের জীবন্ত সত্য কল্যাণের উৎস হয়ে তুমি
জড়তার অবসাদে মৃত্যু হ'তে রক্ষা কর প্রাণ।

অন্তরমন্দিরে মম জ্যোতির্ময়রূপে রহ মন !
সংসারের সমাজের অভিঘাতে যথার্থ চেতনা,
চৈতন্যের সূক্ষ্মতর সুন্দরের আনিয়া প্রবাহ
দূর করি দাও মোর জীবনের বন্ধনবেদনা।
স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা আনে সদা জৈবিক মরণ,
দ্রষ্টারে দেখিতে দাও, চিন্তা মোর কর আজি দাহ।

হেমচন্দ্র বাগচী

দুরাশা

অনাদি ক্রন্দন মোর মর্মতলে আঘাতিয়া ফিরে ;—
কোটি কোটি সিন্ধু-শঙ্খ ঘন ঊর্মি-বিভ্রম-চূড়ায়
শোভে যেন রৌদ্রালোকে, কে যেন রে কেতন উড়ায়,—
লঘু শুভ্র চীনাংশুক— মত্ত বায়ু নিত্য তারে ঘিরে।
সে কী ভীম আয়োজন।— বক্ষ যেন লক্ষ হয়ে চিরে
ধূলিতে মিশাতে চায় আপনার শ্রেষ্ঠ সাধনায় ;
সার্থক করিবে যেন প্রত্যহের তুচ্ছ ব্যর্থতায়।—
দ্বিধা তবু চিরদিন,— প্রাণ তাই গুমরে অধীরে।

এ কী আত্মনাশী তৃষা। নব নব চিন্তারে জড়ায়ে
এ কী ক্ষোভ অহরহ। কী দুর্বার চিত্ত-বিমথন।
ভাষা এরে নাহি পায় ; আশা তবু ঘুরায়ে ঘুরায়ে
দেখে লয় হৃতরত্ন ; পঙ্গু যেন করিবে লঙ্ঘন
দুর্গম শঙ্কর-শৃঙ্গ ! মনে হয়, শিখর ছাড়ায়ে
উঠিয়াছে বীর-শির— বিন্ধ্য নয়— চুম্বে সে গগন।

রাধারাণী দেবী

প্রাণতীর্থ-যাত্রী

প্রাণতীর্থ-যাত্রী মোরা গৃহ-উদাসীন,
কলঙ্কের কলরোল ধ্বনিছে পশ্চাতে ;
স্নেহশূন্য স্বজনের গ্লানির সম্পাতে
আজি মোরা অখ্যাতির গৌরবে বিলীন।

সুন্দরের শঙ্খধ্বনি শুনেছি যেদিন,—
শৈলশৃঙ্গ টলে যথা তরঙ্গ-সঙ্ঘাতে,
সর্ব দ্বিধা বাধা লজ্জা ঠেলি দুই হাতে,
সাড়া দিছি সে আহ্বানে ভয়কুণ্ঠাহীন।

আনন্দ-পাথেয় লয়ে চলিয়াছি পথে,
আকাঙ্ক্ষার গুরুভার নাহি মনোরথে।

যে-দেবতা ঊর্ধ্বে ডাকে মাটির মানবে,
কেমনে আসন তাঁর পাতি ধূলা 'পরে ?
যে-প্রেম সঙ্কীর্ণ প্রাণ দিলো মুক্ত করে—
সে প্রেম কি মূঢ়তায় বন্দী হয়ে র'বে ?

বিগত অতীত

সূর্যাস্তের স্বর্ণরেখা মিলালো আকাশে ;
ধেনু-কণ্ঠ-ঘণ্টাধ্বনি ধীরে ধীরে ক্রমে
দূর হতে দূরান্তরে ক্ষীণ হয়ে আসে !
একটি তারকা একা ফুটিছে সরমে।

নির্জন কাননে এই প্রদোষ-আঁধারে
ভেসে আসে মনে কোন্ জন্মান্তর-স্মৃতি ;
ফুটিয়া উঠিতে চাহে টুটিয়া বাধারে
অতীত কালের দুঃখ-আনন্দের গীতি।

উত্তীর্ণ হইয়া যেন ধরণীর সীমা
হৃদয় লভেছে আজ অসীম মহিমা।

দুঃখে সুখে বিচিত্রিত বিগত অতীত
স্বপ্নের সমান লাগে আজ মনে মনে ;
বর্তমানও স্বপ্নসম আচ্ছন্ন মোহিত ;—
ভবিষ্যৎ ?— সে তো স্বপ্ন সবারি জীবনে।

কানাই সামন্ত

মাধবী

প্রভাতে পথের ফুল যত্নে অবচয়ি
চুমেছি অধরপুটে মোহিত নিলাজ।
বলেছি, 'হে ক্ষুদ্র, শুভ্র মাধবিকা অয়ি,
তোমারে বাসিয়া ভালো ধন্য আমি আজ।'

অচেতন কক্ষতলে কঠিন পাষাণ—
মধ্যাহ্নে ফেলিয়া গেছি, ভুলিয়াছি স্মৃতি।
কে জানে নিভৃত চিত্তে সারাদিনমান
গন্ধরূপে জাগে কিনা মাধবীর প্রীতি।

সন্ধ্যায় বিশুষ্ক ম্লান মাধবিকাগুলি
প্রাণপণে নিঃশ্বসিছে নিঃশেষ সুরভি।
এ ভাষা শুনেছি আমি, শুনিয়াছে ধূলি,
'প্রণয়চুম্বন তব ভুলি নাই কবি।'

আঁধারে কুসুম-সম তারকার চোখে
অশ্রু ছলোছল্ মৃত কুসুমের শোকে।

আবছুল কাদির

সনেট

বাতায়ন তুলি' ওঠে ক্ষণে ক্ষণে বায়ুর নর্তনে,
তরঙ্গিত মেঘ-সম অঙ্গে ওড়ে ঝড়ে নীলাম্বরী।
তারি মাঝে এলে তুমি বৈশাখীর অশ্বরাজে চড়ি',—
সিন্ধুপারে কোথা মোরে সঙ্গে নিয়ে যাবে সঙ্গোপনে ?
কাঁপিছে মন্দির মম মুহুর্মুহু অশান্ত পবনে,—
হে তুরন্ত দস্যু মোর! লুণ্ঠি' সব নিয়ে যাবে হরি',
বক্ষোভাণ্ডে রেখেছিনু যত সুধা সযত্নে আবরি',
সমস্ত ভাসায়ে নিবে আজিকার অশ্রান্ত বর্ষণে ?

বনে বনে চম্পাতলে বাদলের প্রমত্ত প্রলাপ ;
বিত্যুতের ক্ষীণালোকে হেরি হেথা তব বজ্রমুঠি।
পুরাতন গৃহ তরে মোর সব বিফল বিলাপ,—
টুটিয়া অর্গল-দ্বার তুমি মোরে নিয়ে যাবে লুটি'।
আত্মার আসঙ্গে ভুলি সংসারের তুচ্ছ অভিশাপ
কলঙ্কের পঙ্ক হতে পদ্ম-সম উঠিবে প্রস্ফুটি'॥

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সনেট

কবিতা ঘুমায়ে আছে, বুকে মুখে ওড়ে এলোচুল,
অলস শীতের রাতে আলুথালু কবিতা ঘুমায়—
ফেলো না নিশাস তার নিমীলিত চোখের পাতায়,
শিয়রে রেখো না হাত, ডেকোনা, হবে সে মহাভুল।
কবিতা ঘুমায়ে আছে, ঘুমায়েছে ভীরু জুঁই ফুল—
চুপি চুপি কাছে এসো, টিপি টিপি অতি লঘু পায়,
ফ্যাকাশে চাঁদের তলে ঝিলিমিলি আলোয় ছায়ায়,
দূর হতে দেখো শুধু ঘুমে তার শরীর আঢুল।

বিজন শীতের রাতে বুকে যদি কথা জমে ওঠে
আজ তা গোপন করো,— যদি চোখে জল ভরে আসে
নীরবে ঝরায়ে দিয়ো পদতলে হিম-জাগা ঘাসে
খুঁজো না জবাব তার কবিতার ঘুমে-ভেজা ঠোঁটে।
তোমার সাড়ায় যদি কবিতার কাঁচা ঘুম টোটে,
তোমারি স্বপন ভেঙে কবিতা সে মিলাবে আকাশে।

হুমায়ুন কবির

তোমারে দেবার মত

তোমারে দেবার মত নাহি মোর কোন উপহার,
তাই তব জন্মদিনে কি আনিব ভাবি বসি মনে।
অন্তরে ঐশ্বর্য নাহি, নাহি বিত্ত বাহির ভুবনে।
নাহি শিল্পীচিত্ত যদি রচিবারে চাহি অলঙ্কার।
কেবল পরাণ ভরি ভুলে-যাওয়া আছে বহু গান।
খণ্ড, ছিন্ন, ভাসে তা'রা চিত্তাকাশে লঘু মেঘসম।
অতীতের জানা সুর তাও আজি নাহি মনে মম।
যে সুর শুনিনি কভু তা'রাও উতলি তোলে প্রাণ।

পেয়ে যাহা হারাইনু, আর যাহা আজো মেলে নাই,
তারি মাঝে চিত্ত মম রিক্তসম ফেরে ভিক্ষা মাগি।
ফেলিয়া আসিনু যাহা তা'রে ভুলে লুব্ধ চিতে চাই
আজো যাহা অনাগত অলব্ধ রয়েছে দূরে দূরে,—
সেই মোর নিত্য-চলা মর্ত্য-দিগন্তের প্রান্তপুরে
সে অতৃপ্ত চাওয়া মোর কম্প্র করে আনি তোমা লাগি

সমুদ্রের গান

সমস্ত দিবস ভরি' শুধু শুনি সমুদ্রের গান।
চোখের সম্মুখে শুধু সারাদিন দেখি তার খেলা।
নিঃসাড় পড়িয়া আছে ছাইরঙা ঢেউ-ভাঙা বেলা।
আকাশ নিষ্ঠুর নীল নিদাঘের রৌদ্রে করি স্নান।
দিনের প্রখর আলো দিনশেষে হয়ে আসে ম্লান।
রাত্রির স্তব্ধতা ভাঙি অন্ধকারে তরঙ্গ উদ্বেলা
সমুদ্রজলের তলে কাঁদিতেছে কে যেন একেলা ?
স্পন্দিত আলোক জ্বালি করিতেছে কিসের সন্ধান ?

কে কাঁদে কিসের দুঃখে অন্ধকারে এমন করিয়া ?
সমুদ্র-গর্জন-গান ছাপি ওঠে ক্রন্দনের রোল,
উর্মির চপল লীলা অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়,
মুহূর্তে সকল চিত্ত অকারণে ওঠে শিহরিয়া।
মুহূর্ত ভরিয়া শুনি চারিদিকে নিস্তব্ধ কল্লোল,
গগনে একটি ক্ষীণ তারা কাঁপে মেঘের ছায়ায়।

অজিত দত্ত

প্রার্থনা

জীবন জীবন-হীন, রুদ্ধ প্রাণ, অবরুদ্ধ আশা,
বর্ণহীন, দ্যুতিহীন দিনগুলি বিরস, মলিন ;
এই মৃত্যু, হে ঈশ্বর, আর কত ? আর কতদিন ?
আর কত দীর্ঘ দণ্ড হেন তিক্ত মুক্তির পিপাসা ?
নির্জীব সুখের তরে উঞ্ছবৃত্তি, শান্ত ভালোবাসা,
আলস্য-নিষ্ফল চিত্ত, প্রাণ-পন্থা বৈচিত্র্যবিহীন,
হেন পুষ্প-কারাগারে আর কত রুধিয়া কঠিন
খেলিবে আমার সনে তুচ্ছ পণে জীবনের পাশা ?

কৈশোরে দেখেছি স্বপ্নে যে-বিচিত্র বিস্তীর্ণ ধরারে ;
সিন্ধুতলে মৎস্যকন্যা, গিরি-শিরে গন্ধর্ব-নগরী,
সে-বিশ্ব ফিরায়ে দাও ! রেখে না আমারে রুদ্ধ করি'
দাসত্ব-সঙ্কীর্ণ-নেত্র মূঢ়তার কৌতুক-আগারে।
নয়নে ফোটে না তারা মেঘকৃষ্ণ বন্ধ্যা অন্ধকারে,
উন্মুক্ত আকাশ ছাড়া সঙ্গীত আসে না কণ্ঠ ভরি'।

এলিজি

আমি ডাকিলাম তারে নিশান্তের হাওয়ার ভাষায়,
চমকিয়া চাহিলো সে মোর পানে শুধু একবার ;
তারপর ধীরে-ধীরে আঁখি নত করিলো আবার,
শঙ্কিতা কুমারী যথা প্রত্যাসন্ন বিবাহ-নিশায়।
সন্ধ্যার সিন্দূর আঁকা দেখি' তার সুন্দর সীঁথায়—
মূর্খ আমি— তবু, হায়, বুঝি নাই ইঙ্গিত তাহার ;
আবার ডাকিনু যবে, বাঁকাইয়া লঘু দেহভার
চাহিলো সে মোর পানে আধো স্নেহে, আধো ভর্ৎসনায়।

ধীরে ধীরে ঋজুদেহা দাঁড়াইলো উঠি' তারপর,
গৌরবে রাণীর মতো, মহিমায় দেবীর মতন।
কহিলো সে, 'বধূ আমি' ; তারপর করিলো বরণ
অকলঙ্ক মরণেরে ; — অপূর্ব সে মৃত্যু-স্বয়ম্বর !
সে আজ কোথাও নাই। শূন্য গৃহ, অরণ্য, প্রান্তর ;
তাহারে দেখিছে আজ একমাত্র মহান্ মরণ।

পাতালকন্য

যেখানে রূপালি ঢেউয়ে দুলিছে ময়ূরপঙ্খী নাও,
যে-দেশে রাজার ছেলে কুমারীরে দেখিছে স্বপনে,
কুঁচের বরণ কন্যা একাকী বসিয়া বাতায়নে
চুল এলায়েছে যেথা— কালো আঁখি সুদূরে উধাও ,
যে-দেশে পাষাণ-পুরী, মানুষের চোখের পাতাও
অযুত বৎসরে যেথা নাহি কাঁপে ঈষৎ স্পন্দনে,
হীরার কুসুম ফলে যে-দেশের সোনার কাননে,
কখনো, আমার পরে, তুমি যদি সেই রাজ্যে যাও :

তাহ'লে, তোমারে কহি, সে দেশে যে পাশাবতী আছে,
মায়ার পাশাতে যেই জিনে লয় মানুষের প্রাণ,
মোহিনী সে অপরূপ রূপময়ী মায়াবীর কাছে
কহিয়া আমার নাম শুধাইও আমার সন্ধান ;
সাবধানে যেয়ো সেথা, চোখে তব মোহ নামে পাছে,
পাছে তা'র মৃদুকণ্ঠে শোনো তুমি অরণ্যের গান।

নবজাতক

কালস্রোতে ভেসে গেলো জীবনের পুঞ্জিত জঞ্জাল—
স্নেহার্দ্র স্মৃতির তটে লগ্ন ছিলো যতো মিথ্যা প্রীতি,
সখ্যতার ভাণ আর তারুণ্যের মোহান্ধ স্বীকৃতি
প্রাণের বন্যায় ধুয়ে সবই মুছে নিলো মহাকাল।
জীবনের দ্রুতগতি রুদ্ধ করে' ছিলো যে-শৈবাল
যদি লুপ্ত হয়ে থাকে, জানি এ-ই জীবনের রীতি,
সঞ্চয়ে যা গুরুভার, ত্যাগে নিত্য লঘু করে' জিতি,
প্রাণের আবেগ তাই বাধামুক্ত, শক্তিতে উত্তাল।

অপূর্ব গতির হর্ষ, জন্ম হতে ফিরি জন্মান্তরে,
গ্রহ হতে অন্য গ্রহে, মেলে দিয়ে দৃষ্টির প্রসার,—
ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে জাগে অতীন্দ্রিয় আনন্দের স্বাদ,
পথে পথে অভিজ্ঞান রেখে চলি ত্যাগের স্বাক্ষরে,
বর্জনের উপার্জনে পূর্ণ করি পাথেয় যাত্রার,
বারংবার মৃত্যুরূপে আসে জীবনের আশীর্বাদ॥

সুনীলচন্দ্র সরকার

পিদ্দিম

সামান্য পিদ্দিম, তার আলো ঠিকরে যায়,
ডিঙিয়ে পাঁচিল ওঠে মন্দির-খিলানে,
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আভা গাছের আঁজলায়
মেঘেও চমকায় গিয়ে— হয়তো— কে জানে!

তারপর? ফাঁক পেলে, এমন সে নয়
পিছোবে ঝাঁপ না দিয়ে নীলপদাম্বুজে,
অস্পষ্ট হৃৎপিণ্ডে পার হবে দিগ্বলয়,
কেন সে থাকবে লেগে কেবলি পিলসুজে?

আমরা ছড়াই শুধু ছায়ার হেঁয়ালি
কিংবা ধোঁয়াতে থাকি কুলুঙ্গিতে ঢুকে,
জানি না জ্বালিয়ে লক্ষ জীবন-দেয়ালি
পৃথিবী কি কথা বলে অনন্তের মুখে।

অচেনা মায়ের স্তন্য অসীমের হিম:
আমরা মানি না মানি, জানে তা পিদ্দিম!

বুদ্ধদেব বসু

বিবাহ

যাহারে স্মরণ করি' সিন্দূর দিতেছো শুভ্র ভালে,
হে সুন্দরী, সে কি তব হৃদয়ের সীমাপ্রান্ত-'পরে
নামে বর্ষণের মতো ? উচ্ছলিত লীলাভঙ্গি-ভরে
তরঙ্গ তুলিয়া যায় খরস্রোতে, তীব্র দ্রুত তালে ?
তুমি কি দেখেছো তারে অন্তরের স্তব্ধ রাত্রিকালে
বিশ্বের রহস্য-তল উন্মীলিত প্রহরে প্রহরে ?
চরম মিলন-লগ্নে নিবিড় নিমগ্ন পরস্পরে—
কী দুর্লভ আবিষ্কার তবু যেন রয়েছে আড়ালে !

অথবা লভেছো তারে বিধানের অন্ধ মূঢ়তায়
বাসনা-উত্তাপহীন, নিশ্চেতন সঙ্কীর্ণ সংগমে ?
অনায়াস যুগ্মযাত্রা চিন্তাহীন আরামে মসৃণ ?
অথবা কি পরস্পরে কামনার উন্মত্ত বিভ্রমে
মুহূর্তে নিঃশেষ করি', হারায়ে ফেলেছো উদাসীন,
প্রাত্যহিক তুচ্ছতায়, তন্দ্রা-বিজড়িত জড়তায় ?

ইলিশ

আকাশে আষাঢ় এলো ; বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল
মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেল-সারি
বৃষ্টিতে ধূমল ; পদ্মাপ্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ি
বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপট-সম অচঞ্চল।
মধ্যরাত্রি ; মেঘ-ঘন অন্ধকার ; দুরন্ত উচ্ছল
আবর্তে কুটিল নদী ; তীর-তীব্র বেগে দেয় পাড়ি
ছোটো নৌকাগুলি ; প্রাণপণে ফেলে জাল, টানে দড়ি
অর্ধ-নগ্ন যারা, তারা খাদ্যহীন, খাদ্যের সম্বল।

রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে
জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি রাশি ইলিশের শব,
নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়।
তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে-ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ, কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার
সরস শর্ষের ঝাঁজে। এলো বর্ষা, ইলিশ-উৎসব।

৬

নেশা

মাতাল, মাতাল হও— বোদলেয়ার দিলেন বিধান—
অবিরাম পেণ্ডুলামে যে তোমার উপাংশুঘাতক,
সেই ক্রূর কালের চতুরতর হও কালান্তক :—
পুণ্য, প্রেম, মদিরা, কবিতা তাঁর প্রখ্যাত নিধান।

তাঁর আজ্ঞা অমোঘ ; অথচ দান, জপ, তপ, ব্রত,
এ-সবের ক-অক্ষর আশৈশব গোমাংস আমার,
দিগন্তে মিলায় ক্রমে রশ্মিরাগ প্রেমান্ত-সন্ধ্যার ;
এবং তন্মাত্র ট্যাঁকে পানপাত্র দূরপরাহত।

বাকি থাকে কবিতা— অস্তিত্বময় অণুর বন্ধন,
হ্লাদিনী, ব্যাধির বীজ, উন্মাদক, নিষ্ঠুর, অসুখী,
সরস্বতী, ভেনাস, ক্ষণিক লক্ষ্মী, অনন্ত বাসুকী—
মেটাতে আমার তৃষ্ণা আমাকেই করে সে মন্থন !

ভালো— কিন্তু বলো দেখি, হ'তে হবে আর কতকাল
একাধারে দ্রাক্ষাপুঞ্জ, বকযন্ত্র, শুঁড়ি ও মাতাল !

না-লেখা কবিতার প্রতি

অনন্ত জন্মের দ্বার ; মরণের অন্ত নেই কত :
বীজাণু, সরল ক্ষুর, হাঁটুজল, এক ফোঁটা বিষ।
এবং প্রভাবে তার নেই কোনো বিশ কি উনিশ,
শেলিও ততই মরে, শুকনো বুড়ি ধুঁকে-ধুঁকে যত।

এমনকি জন্মের আগেই তার আরম্ভ ; কেননা —
একটি আমের মূল্য শত লক্ষ মুকুলসংহার ;
যদিও একত্রে ছোটে জীবনের কোটি সম্ভাবনা,
পথে সব মরে গিয়ে, খুঁজে পায় জরায়ুর দ্বার

শুধু এক — শ্রেষ্ঠ নয়, বলীয়ান, আগ্রহে স্বাধীন ;
হয়তো সে নিরীহ বেচারামাত্র, তবু জ্যান্ত চলে,
অজাত বিক্রমাদিত্যে সকলেই অনায়াসে ভোলে।
তোমরা, এখনও যারা সীমান্তেই রয়েছো বিলীন,

আমাকে দিয়ো না দোষ ; নিত্য আমি আছি অনর্গল ;
কিন্তু বারে-বারে দেখি তোমাদেরই বিভিৎসা দুর্বল।

বিষ্ণু দে

শান্তির শরতে এসো

অরণ্য এ মন, ঘনসবুজের বন্য অন্ধকারে
উদ্যত পেশল লাফ, অগ্নিকণা জেলে দুই চোখে
স্তব্ধ অপেক্ষায় বসে হিংস্র থাবা পিপাসিত নখে
প্রস্তুতিতে থরো থরো, যেন রুদ্রবীণা তারে তারে
মোচড়ে মোচড়ে বাঁধা, প্রায়াসন্ন যুগান্তের শব্দ।
অরণ্য এ মন, বর্ণে বর্ণে প্রকৃতির ছদ্মবেশে
উদ্যত ঘৃণার তীক্ষ্ণ আক্রমণ বসে ছায়া ঘেঁষে,
স্থির বসে, যেন ক্ষিপ্র বজ্রের সঙ্গীত স্তব্ধ—

চতুর শিকারী! তুমি সাবধান, তুমি সাবধান।
বরঞ্চ অরণ্য ফেলে মাঠে এসো সমান আকাশে,
শান্তির শরতে এসো, শাদা মেঘে এসো নম্রনীলে,
এসো কৃষ্ণসারের গতিতে, বনতিত্তিরের গান
কান ভরে দিক্, এসো আমনের সচ্ছল বাতাসে
সংহত মধুর এই মুক্ত স্বচ্ছ সবার নিখিলে॥

মানিকতলা খাল

মৃত্যুর তমসাতীরে, কীটদষ্ট শিরে
তোমার মুক্তির বাণী ঝরে চক্রবাক্
উন্মোচিত, হে বাচাল ! শূন্যাক্ষরা নীরে
বিড়ম্বিত জিজ্ঞাসার বক্র জটাপাক ।

ব্যর্থ বটে মাধুর্যের সাধনা নিবিড়,
ব্যক্তিত্বের রন্ধ্রহীন দরবারী বিকাশ,
স্বয়ম্বশ ধর্ম বৃথা, হায় নষ্টনীড় !
অশ্বত্থে বজ্রাগ্নিপাতে বৃথাই আকাশ !

মৃত্যুর তমসাতীরে তীব্র আত্মদানে
শূন্যের বিরাট নীলে মেলে দাও পাখা ।
প্রাণসূর্যে স্তব করো, যদি আর্তগানে
খুলে যায় আদিগন্ত হিরণ্ময় ঢাকা,

যদি তব শূন্যে স্থূল জনতা সংঘাতে
আনন্দতড়িৎ নৃত্যে অণুসূর্য মাতে ॥

ইলোরা

আকাশে তোমার মুক্তি ; যে-কৈলাস বেঁধেছে ভাস্কর
তোমার ঊর্মিল নৃত্যে, নীলিমা সে-নৃত্যের সঙ্গিনী ;
সেখানে নেইকো সোনা কৌটিল্যের নেই বিকিকিনি,
সেখানে শূন্যের চোখে সম্পূর্ণতা স্বাধীন, ভাস্বর।
সে- দক্ষযজ্ঞের নাটে স্থিতি কাঁপে সংহারে-সংহারে,
রাজসূয় অসূয়ার যুগ গত কুমার-সম্ভবে ;
নটরাজ সর্বহারা নীলকণ্ঠ গালবাগুরবে
পায়ে-পায়ে পৃথ্বী জাগে সতী তোলে সর্বংসহারে।

সন্ন্যাসী, তোমার মুক্তি বাঁধা জড় পাথরে আকাশে,
রৌদ্রেজলে ছায়াতপে বর্ষে-বর্ষে উন্মুক্ত স্বাক্ষর
কঠিন কষ্টিতে লেখো নীলাকাশে, কালের ঈশ্বর !
আমরা ভাস্কর, নই মূর্তি, মুক্তি আনি কর্মে চাষে,
যন্ত্রের ঘর্ঘরে, নিত্য আন্দোলনে, মুষ্টিভিক্ষা আসে
নীলকণ্ঠ আমাদের মুক্তি নিত্য। আমরা নশ্বর ॥

সনেট

আমি তো ছিলাম শূন্য তেপান্তরে উদ্বাস্তু পাথর,
নিকষ পাহাড় কিংবা টিলা, কিংবা, বলা যায়, ঢিপি,
তুমি শুরু ক'রে দিলে তোমার শকাব্দে শিলালিপি ;
আজ যদি যাও তবে মুছে যাও সমস্ত স্বাক্ষর।

আমি যা ছিলাম, একা, অবিচল, পাললিক শিলা
তাই শুধু রেখে যাও, নিয়ে যাও দীর্ঘ ইতিহাস,
যাবে যদি যাও দূর ইন্দ্রপ্রস্থ মথুরা মিথিলা,
আমার আদিম সত্তা নীল শূন্যে ফেলুক নিঃশ্বাস।

না-হলে অন্তত ভাঙো তোমার খোদাই সব স্মৃতি,
ভেঙে ভেঙে ছারখার ক'রে দাও ভাস্কর্য-বাহার,
আমাকে ছড়িয়ে যাও ইতস্ততঃ বৃষ্টির আহার,
ভেঙে যাব ঢল-স্রোতে, ভেসে যাবে বাস্তু কালচিতি।

কোথায় পালাবে তুমি, তোমারই এ স্মৃতির পাহাড়,
ধূর্ত অগস্ত্যেরও কাছে কখনো সে নোয়ায়নি ঘাড়॥

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সনেট

অনুতাপে ক্লান্ত মন চেয়ে দেখে তোমার শরীর,
নিস্তাপ পাণ্ডুর ছায়া ধীরে ধীরে শয্যা ছেয়ে ফেলে ;
যদিও জেনেছি এই ঃ এ জীবন পদ্মপত্রে নীর ;
তবুও প্রপঞ্চ মায়া নবরঙ্গে ঊর্ণাজাল মেলে।

আশার ছলনে ভুলি শেষবার ডেকেছি তোমায়
ভেবেছি কলঙ্ক মোর মুছে যাবে জীবনের টানে
অক্ষম জীবন হবে মহীয়সী একদা ক্ষমায়
জানি প্রেম পরাশ্রিত ভিক্ষাজীবী করুণার দানে।

জীবন যে তুচ্ছ ছিল সে কি আজ মৃত্যুর প্রাক্কালে
লিখেছে কপালে মোর লোকায়ত অলঙ্ঘ্য বিধান ?
মৃত্যুর ঘনান্ধ তীরে শেষ কথা প্রলয়ের কালে
দিয়েছে আমায় মুক্তি, হয়নি কো শাপ অবসান।

সময় গিয়েছে মুছে অন্ধকাল পড়ে না স্বাক্ষর,
আমার বৈধব্য জানি ক্ষমাহীন জীবনের পর।

দিনেশ দাস

রবিবার

ছ'দিন আগুন জ্বলে। ঠিক তারপরে
রবিবার ছুটিবার ভিজে-ভোর আনে।
চোখে মুখে ভিজে রোদ ভিজে হাওয়া ঝরে,
অলস তরল ভিড় চায়ের দোকানে।
পথে মোড়ে রকে তর্কের তুফান বাড়ে,
হঠাৎ হাল্কা খুশি উপ্‌চিয়ে পড়ে,
রুপোলী মাছের ঘাই দিয়ে লেজ নাড়ে,
ঘুরে ফিরে জোট বাঁধে— একা খেলা করে।

ছ'টি গদ্য লাইনের হ'লে মাথা হেঁট
সহসা সপ্তম ছত্র ছন্দে পরিণত—
একটি লাইনে যেন একটি সনেট।
বাঁধা এই লাইনের কয়টি অক্ষর
অনন্ত কালের কোলে মিনারের মত—
সূর্যের সময়ে এক অনন্ত প্রহর॥

সুশীল রায়

শ্রীমধুসূদন

প্রার্থনা পূরণ করো।— যেন চতুর্দশপদী-পদে
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম এনে রাখতে পারি। কবতক্ষ যদি
ক্ষীণতোয়া তবু ধন্য সান্নিধ্যের সুবর্ণ সম্পদে,
আমাকে কৃতার্থ করো— হতে দাও শীর্ণ শাখানদী।

ছোট শাখানদী আমি, হয়ে আছি ক্ষীণ নম্রস্রোতা,
কল্লোল বাজে না গানে, তরঙ্গেও বাজে না গর্জন।
শতধারা নিয়ে আসে পুণ্যতোয়া— কে দেখেছে কোথা?
কার ঘরে নিত্য এসে দেখা দেয় শ্রীমধুসূদন?

নিবিড় অরণ্য-মাঝে একাকী রয়েছি মাথাহেঁট,
জল অপর্যাপ্ত— গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা করি তাই,
এনেছি তোমার জন্যে বহুকষ্টে সামান্য সনেট
শতবর্ষ আগে যার জ্বেলেছ নতুন রোশনাই।

তোমার কথায় বলি, অন্য কথা কোথা পাব খুঁজে
নমি আমি, নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে।

মৃণালকান্তি দাশ

রিক্ত

দিবাস্বপ্ন, ভ্রষ্টলগ্ন অন্ধকারে তারা হয়ে ফুটে।
কোন অন্ধ নদীজলে ভেসে যায় হৃদয়ের ঢেউ।
সোনার হরিণ ওই ধায় কোথা জানিনে তো কেউ—
অন্ধ আত্মা জানি শুধু তবু তার পিছু পিছু ছুটে।

হেরি রিক্ত হাহাকার হেমন্তের উন্মুক্ত প্রান্তরে,
শ্যামল শস্যের শীর্ষে ফুরায়েছে ফসলের গান।
দিগন্তে জ্বলন্ত চিতা— ব্যর্থদিন করে মৃত্যুস্নান—
অনাদি কালের বুকে নিরবধি বিষণ্ণতা ঝরে।

ছিন্নহার মৃতস্বপ্ন নিরন্তর কোথা যায় চলি ?
মিথ্যা তবু খুঁজে মরি আমি প্রেতপদাঙ্ক তাহার,
বিবর্ণ ধূসর দিন— খুঁজি সেই ভস্ম বাসনার—
আনমনে আহরি সে ধূলিম্লান ছিন্নদলগুলি।

কোন দূর পলাতক দীপ্ত দিন ক্লান্ত কল্পনার ?
হেরি শুধু সম্মুখেতে অতীতের হিম অন্ধকার।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

হঠাৎ-হাওয়া

আমরা নিস্তেজ বড়ো ; রুদ্ধশ্বাস মনের গভীরে
নিরুত্তাপ সমারোহ, প্রস্ফুটিত শত শতদল
বজ্রতাপে সেখানে মূর্ছিত। ছিন্ন, শতধাবিকল
শরীরের যন্ত্র যতো, অশোকের পলাশের ভিড়ে

উচ্ছ্বসিত হয় না হৃদয়। শূন্য, ভারবাহী মন
মেঘের গুমোট দেখে ভয় পায়, রৌদ্রের ভিতর
শুধু দেখে স্বেদাক্ত তিমির ; জীবনের শান্ত রূপান্তর
মধ্যপথে প্রতিহত, প্রতিরুদ্ধ নীলাকাশ, বন।

তারপর হাওয়া বয়, কী উন্মুক্ত, কী সুন্দর হাওয়া !
রন্ধ্রে-রন্ধ্রে তোলে সুর, গাছে গাছে মত্ত আলোড়ন।
মুঞ্জরিত সারা দেহ, চমকিত প্রসুপ্ত যৌবন,
বহু লুপ্ত অনুভূতি অকস্মাৎ ফের ফিরে পাওয়া।

হাওয়া যে উদ্দাম হ'লো, অকস্মাৎ হ'লো কি স্বৈরিণী,
মুখে চোখে চুমু খেয়ে, হ'তে চায় জীবনসঙ্গিনী।

হরপ্রসাদ মিত্র

বিরহ

বালুচর জ্বলে ধূ ধূ— সুদীর্ঘ সময়,
উড়ে গেছে শ্বেতপক্ষ যাযাবর পাখি !
আকাশে অবাধ শূন্য, আর কিছু নয়,
নির্লিপ্ত, অলস চোখে দূরে চেয়ে থাকি ।

সবুজ ইশারা নেই তৃণহীন চরে ।
জলের পশুর হাড় বিক্ষিপ্ত ধূলায় ।
পিশাচী হাসির ধ্বনি বাতাসের স্বরে ।
একাকী দর্শক আমি এ শিব-লীলায় ॥

এখানে সমুদ্র ছিল নীলাম্বু নিথর,
আদিম প্রাণের বন্যা নিবিড় নীলিমা ।
এখানে সমুদ্র ছিল অগাধ, দুস্তর,
উছল জলের দীপ্ত, অশান্ত মহিমা !

তুমি চ'লে গেলে আর, সমুদ্র তো নয়—
বালুচর জ্বলে ধূ ধূ,— সুদীর্ঘ সময় !

গোপাল ভৌমিক

লোকটা

লোকটা বিস্ময় বটে, এই বৈশ্য যুগে
না করে বেসাতি, সে করে হৃদয় নিয়ে
মাতামাতি ; অনাহারে রোগে ভুগে ভুগে
পাণ্ডুর দু' চোখ তার, তবু তাই দিয়ে

সে চায় দেখতে ওই দূরের আকাশে
কি করে ঘনায় সন্ধ্যা রৌদ্রমাখা
চিলের ডানায়, কি করে মেঘেরা ভাসে
রাত্রির বুকে যেন ছায়াছবি আঁকা।

মাটি মা'কে ভাল বাসে, তাই ঘাসে শুয়ে
ভাবে সে অনেক কথা, আকাশ পৃথিবী,
ভাবে সে কি করে মিলে দুয়ে আর দুয়ে
চার হয় ; ওদিকে যে জমে উই ঢিবি

পরবাসী করে তাকে স্বদেশে স্বঘরে
ভুলে সে থাকেই বসে হৃদয়-চত্বরে।

মণীন্দ্র রায়

বরং গভীরতর

রাস্তার রেলিঙে বাঁধা নদী-নৌকা-নারকেল সারির
আহ্লাদিত ছবি, কিংবা খেয়ালি চিঠিতে দু'লাইন
উদ্ধৃতির উত্তেজনা, শুধু এই ইচ্ছা যদি ভিড়
করে, তবে কী পাবে এখানে ? কোনো বেতাল বা জিন

আমার দখলে নেই। কিছুই পাবে না অনায়াসে।
না ফুল, না গান, স্বপ্ন, সৃষ্টির দলিলে বকলম
চলে না। বেহুলা তাই মৃতকে ফিরাতে নিজে ভাসে -
ভীষণ সুন্দর নাচে স্বর্গ টলে, পরাজিত যম !

এসো না এখানে তবে উদাসীন বিদেশীর মতো
ডায়েরার আমন্ত্রণে। মন্দিরের পাথরে, গুহায়
কিন্নর, দেবতা, নারী, অতীত-রোমন্থে মূর্ছাহত।
পরিচিত পথে পথে দৃশ্যশস্য জাগে, ঝ'রে যায়।

বরং গভীরতর অন্ধকারে এসো, অন্তঃশীল
দেখ কী ঐশ্বর্য জ্বলে স্বপ্নময় রেডিয়ামে নীল ॥

বাণী রায়

অরণ্যমর্মর

হে পৃথিবী, বুকে কত শ্যামল স্বপন ;
আমের মুকুল-ঝরা কত তৃণদল ;
ভাঁটির ঝোপেতে কত পতঙ্গ বিহ্বল,
ছায়াঢাকা রোদমাখা সকালের ক্ষণ !
কচি-লাল আমপাতা নাচিয়ে পবন
ব'য়ে গেল দোলা দিয়ে বাতাপির ফল ;
সুবাসের ভারা নিয়ে বন টলমল ;
বসন্তের ফুলঘ্রাণে, পতঙ্গ উন্মন ।

এরি মধ্যে ঝোপে ঝাড়ে রেখেছ কি পাতি
বিভ্রান্ত কবির জন্য নিরালা আবাস ?
তোমার বুকের ঘন অঞ্চল শিথিল
হে পৃথিবী, সেথা সুপ্ত মায়াবিনী রাতি !
আমাকে ডাকিল কাছে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,
জন্মান্তের গূঢ় এক সম্বন্ধ জটিল ॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তোমার স্বপ্নের মঠ

সতত তোমার আর্তি আমার রাত্রির ঘুম থেকে
তৃপ্তির আলস্য নিয়ে খেলা করে ; নিশির যন্ত্রণা
একতারার মতো বাজে ; শ্রান্তিহীন রক্তের অসুখে
বিবর্ণ সান্নিধ্য আনে অস্বস্তির আমৃত্যু সান্ত্বনা।
সতত তোমার ক্লান্তি আমার নির্বোধ হাহাকারে
মল্লারের সুর বাঁধে, কালের গলিতে তমসায়
ফণীমনসার ঝোপে, সূর্যোদয় রক্তাক্ত গহ্বরে
সর্বাঙ্গে প্রহারক্ষত দ্বিপ্রহর সঙ্গীত ছড়ায়।

সতত তোমার মৌন আমার জীবনে সূর্যমুখী
মৈত্রীর আশ্বাসে ফোটা একটিই আরক্ত কুসুম
দীর্ঘশ্বাসে ছিঁড়ে নেয় ; নিষ্ফলের সন্ধ্যায় একাকী
নিঃসঙ্গ গায়ত্রীমন্ত্রে পুড়ে যাই ; নিবন্ত নিঝুম
রোগশয্যায় তবু জ্বলি : ধূ ধূ মাঠ, অবাক জোনাকি,
প্রলাপের নটী নাচে মৃত্যূত্তীর্ণ ললাটে কুঙ্কুম ॥

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

চোখ

তোমার দুচোখে দেখি অতীতের বসন্ত-বাহার
কবেকার পিছনের নগর ও উপনগরের
লুকানো অনেক কথা, বহু মৃত্যু, অনুরাগ ঢের,
অজস্র ফাল্গুন স্বাদ, বিরহের অনেক আষাঢ়।
সন্ধ্যার বর্ণাঢ্য মেঘ প্রতিভাত দেখেছি কখনো,
কখনো বা জীবনের পরমার্থ আদরে সোহাগে
চোখের প্লাবনে মেতে ডাক দিয়ে গেছে অনুরাগে
কখনো গলেছে তনু, কখনো বা ভিজে গেছে মনও।

তোমার দুচোখ ভরে জীবনের অগাধ ইশারা,
আজো সেথা রেখায়িত পৃথিবীর প্রথম স্বপন—
কর্মম্লান হৃদয়ের ক্ষতে যেন বাঁচার প্রলেপ।
আগুনের নীলশিখা জ্বলে, জন্মে প্রাণবতী তারা—
মনের অলিন্দ ছুঁয়ে অতর্কিতে আশ্চর্য যৌবন
ছন্দায়িত করে তোলে সময়ের খণ্ড পদক্ষেপ।

অরুণকুমার সরকার

ঘুম

কেটেছে সমস্ত দিন অনাত্মীয় রুক্ষ পরিবেশে
হে রাত্রি, মিনতি শোনো, মিত্র হও, কটাক্ষ হেনো না।
ঘুম, শুধু ঘুম দাও, নিয়ে যাও সেই নিরুদ্দেশে
যেখানে স্মৃতির শব অন্ধকারে আগাগোড়া বোনা।

স্থূল আস্তরণে ঢাকা ; দুপুরের দীঘির মতন
আমার সমগ্র সত্তা মৃত্যুমগ্ন নিঃস্পন্দ নির্বাক ঃ
নেই, নেই, কিছু নেই ; নেই নেই এই দেহ মন ;
প্রত্যহের ভ্রূকুঞ্চন, নিরানন্দ কুকুরের ডাক

আর দূর আকাঙ্ক্ষার বক্ররেখা অপ্রতিভ নদী।
স্বপনের সরোবরে বিকশিত শ্বেতশতদল
দূরে যাক, পড়ে থাক। স্মৃতিহর ঘুম পাই যদি
ভেসে যাই, ডুবে যাই, মুছে যাই অগাধ অতল।

হে রাত্রি, মিনতি শোনো, প্রিয়তম, অনুকম্পা করো,
বিনত শরণাগত থরো থরো দেহ তুলে ধরো।

নরেশ গুহ

কাক

কলকাতা কৈলাস তার গ্রীষ্মের বিবস্ত্র দুপুরে।
বর্ষায় বিরক্তি নেই। কীটে-কাটা গরম র‍্যাপার
ভাঁজ খুলে শুকোয় না শীতে কাবু বুড়ো রোদ্দুরে।
ক্ষয় করে উপেক্ষায় কুটিলের রসনার ধার।

আনন্দে ক্ষুধায় ক্ষোভে হাহাকার করে দিগ্বিদিকে।
তাড়ায় সূর্যের ঘুম জঠরের অজেয় জ্বালায়।
ম্লান শ্বেত শ্লথ হাতে আশাবরী উষা দেয় লিখে
আকাশে প্রভাত : আহা, পৃথিবীর মলিন থালায়

অতীত রাত্রির বাসি উচ্ছিষ্টের সুস্বাদু প্রসাদ
মাতৃহীন তারে সাধে শুদ্ধাচারী কপট বিমাতা
সুন্দরী সৌখীন দিন ! আর তার বৃথা আর্তনাদ
সংসারে সান্ত্বনা খোঁজে। বিকেলে মর্মর করে পাতা,

আলো নেভে। হানা দেয় তান্ত্রিক নিশির তিন ডাক।
সারারাত্রি শিরে তার পাতা ঝরে। সে ঘুমায়। কাক ॥

জগন্নাথ চক্রবর্তী

মধুসূদনের প্রতি

শ্রীমধুসূদন তুমি কবিকুলমণি
অদ্বিতীয়। ম্রিয়মাণ যখন শৈবলে
অনুবিদ্ধ সরসিজ নিস্তরঙ্গ জলে
আনিলে তখন মন্ত্র সুগম্ভীর ধ্বনি
আশ্চর্য। অমিত্রাক্ষরে গড়িলে সরণি
শ্লাঘনীয়। তুঙ্গ-স্বর্ণ-যশের দেউলে
উঠিলে দুর্গম দৃপ্ত প্রতিভার বলে—
নববঙ্গে দ্বৈপায়ন অমৃতলেখনী।

কমলে কামিনী আমি দেখিনি স্বপনে
কিংবা কোন কুললক্ষ্মী, যশের মন্দিরে
দুর্লভ ফলক কোন করি না প্রত্যাশা;
শুধু ভাবি, না রহিলে জ্যোতিষ্ক গগনে
গগন বৃথা। কাব্যের কপোতাক্ষ তীরে
ইচ্ছা হয় বটবৃক্ষশাখে বাঁধি বাসা।

রাম বসু

জনান্তিক

সত্যিই দুঃখের কথা সূর্যাস্তের পাহাড়ের ধারা
অহর্নিশ হিংসা জ্বলে, কণ্ঠে ওঠে জন্তুর চিৎকার
মানুষে মানুষ ছেঁড়ে পূর্ণিমার সমুদ্র কিনারে
কী লজ্জার কথা এই ; এই এক নিষ্ঠুর ধিক্কার।

ভাবতে অবাক লাগে; কত বড় এ পৃথিবী, তার
কী নিষ্পাপ ধান শীষ, নীলাকাশ প্রস্মৃতির মুখ,
কথা যেন প্রজাপতি, নারী বৃন্ত রজনীগন্ধার
হৃদয়ে বনের স্বর, স্বপ্ন তার ছায়ার কৌতুক।

মাটি নারী শস্য প্রেম এই নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড জীবন
এ ছাড়া আর কি বলো ? যা সহজ তাই ত সুন্দর
মিল তাই পদে পদে অন্ধকারে আগুনে মিলন
সাজায় শ্রীমতী নদী সন্ধ্যালোকে সোহাগের ঘর।

অথচ হঠাৎ শোন স্তব্ধতায় হত্যার চিৎকার
কী লজ্জার কথা এই, এই এক নিষ্ঠুর ধিক্কার।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

অলক্ষ্যে

আমার মৃত্যুর পর কেটে গেলো বৎসর বৎসর ;
ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতির ব্যর্থ প্রচেষ্টাও আজ অগভীর,
এখন পৃথিবী নয় অতিক্রান্ত প্রায়ান্ধ স্থবির ঃ
নিভেছে প্রধূম্রজ্বালা, নিরঙ্কুশ সূর্য অনশ্বর ;
স্তব্ধতা নেমেছে রাত্রে থেমেছে নির্ভীক তীক্ষ্ণস্বর—
অথবা নিরন্ন দিন, পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা ;
উদ্ধত বজ্রের ভয়ে নিঃশব্দে মৃত্যুব আনাগোনা,
অনন্য মানবসত্তা ক্রমান্বয়ে স্বল্প পবিসব !

গলিত স্মৃতির বাষ্প সেদিনেব পল্লব শাখায়
বাবম্বাব প্রতারিত অস্ফুট কুয়াশা বচনায় ;
বিলুপ্ত বজ্রেব ঢেউ নিশ্চিত মৃত্যুতে প্রতিহত ।
আমাব অজ্ঞাত দিন নগন্য উদাব উপেক্ষাতে
অগ্রগামী শূন্যতাকে লাঞ্ছিত ক'বেছে অবিরত
তথাপি তা প্রস্ফুটিত মৃত্যুর অদৃশ্য দুই হাতে ॥

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

সনেট

তোমার আমার মাঝে ব্যবধান গড়ে বারম্বার
তুমি কেন সুখ পাও ! দুই হাতে অনুপম মুখে
আমার প্রাণের পাত্র তুলে ধরি সুমুখে তোমার
পান করো, তুমি সখি, বিনিঃশেষে চুমুকে চুমুকে।

যৌবনের আর্যাবর্তে একচ্ছত্র রাজ্যেশ্বরী তুমি,
জেনো, আমি দীনহীন শরণার্থী তোমারই সে প্রজা,
বাস্তুচ্যুত করে কেন কেড়ে নাও স্বদেশ, স্ব-ভূমি ?
যদি চাও, শাস্তি দাও ; ইচ্ছে মতো করো বাঁকা সোজা।

কাঙাল আমাকে দেখে লজ্জা পায়, ভিক্ষুকেরা হাসে,
দিগম্বর করুণায় বিগলিত দেখে মোর বেশ,
এরি মধ্যে মীনকেতু সকৌতুকে বেঁধে নাগপাশে
চূড়ান্ত করেছে যেন, অতর্কিতে, দুর্গতির শেষ।

মিডিয়ার মতো সখি, যদি পারো, কোনো মন্ত্রবলে
আহতকে প্রাণ দাও, বন্দী করো বাহুর শৃঙ্খলে।

অরবিন্দ গুহ

দিবা-স্বপ্ন

দৃষ্টির সম্মুখে দেখি উদ্ভাসিত নব মহাদেশ,
বিশুষ্ক শরীর শোনে হৃদ্‌পিণ্ডের উল্লসিত ধ্বনি ;
সমুদ্রের লবণাক্ত স্রোতাবর্তে ক্ষুধাতৃষ্ণাক্লেশ
নিমেষে বিলুপ্ত হলো। এই সেই ইন্দুনিভাননী।

এই সেই মহাদেশ ? আবিষ্কারকের অনুভূতি
আমাকে বিভ্রান্ত করে ; চোখে দেখি বিচিত্র দীপালি ;
আজ যেন ধন্য হয় পৃথিবীর প্রত্যেক প্রসূতি ;
সব বন্ধ্যা বৃক্ষ হোক অবিলম্বে অতিপুষ্পশালী।

তারুণ্যের আকর্ষণে গৃহহীন ; সমুদ্রের স্রোতে,
রক্তে, তীব্রতায় পলে-পলে সম্মিলিত পরমায়ু ;
আমি উত্তরায়ণের প্রতীক্ষার শরশয্যা হ'তে
যা প্রত্যক্ষ করি তা কি সুখস্পর্শ দিব্যগন্ধ বায়ু ?

দিবাস্বপ্ন। চিত্তমোহ। আজ আমি খণ্ডিত, বহুধা।
সম্মুখে অখণ্ড সিন্ধু— ক্ষমাহীন ক্ষুধাহীন ক্ষুধা ॥

শঙ্খ ঘোষ

বিবাহার্থী যুবকের উদ্দেশে

অনায়াসে বসতে পেলে অধিকাংশ যুবা চায় শুতে।
— এই তত্ত্ব মনে জেনে চতুর যুবতী-প্রতিনিধি
জন্মসূত্রে যেই সব অধিকার দিয়েছিল বিধি
ব্যবহার করে তার সুনিপুণ উরুতে-ভুরুতে!

বটানিক্সে যাওয়া যাবে, কিংবা দলবলসহ জু-তে,
গরমে, পূজোর বন্ধে বাইরে না বেরুলে পড়ে ঢি.ঢি,
নৈনিতাল দার্জিলিঙ রাঁচী পুরী অথবা গিরিডি
উড়িয়ে-তাড়িয়ে তবু হৃদয় ঈষৎ খুঁতখুঁতে।

হতাশ প্রণয়-পক্ষী কবে যাবে আপন বাসায়?
দাঁতে দুটো পান পিষে, হাতে নিয়ে কুচোনো সুপুরি
পথে যেতে পাওয়া যাবে কিছু প্রাপ্য, কিছু-বা উপরি,
প্রভেদ রবে না কিছু ধরণীর কাঁচা ও ডাঁসায়!

উল্টোমুখে চেয়ো না হে, লোক বলবে মজেছে কু-রসে,
যে দাঁড়ায় ভাগ্য তার দাঁড়ায়— যে বসে তার বসে॥

তরুণ সান্যাল

স্মৃতি

দু'একজন বন্ধু শুধু স্মৃতি হবে, বাকি সব মৃত,
ধূলায় কাদায়, কিংবা জনপদে,চিক্কণ সড়কে—
বারেক দাঁড়াও যদি, দেখিবে, যা যুগের নিভৃত
তার শিরে কণ্টকের শিরোপা, সে জটিল নরকে

হয়ত ভাবিবে তুমি,— স্খলিত পুণ্যের জয়মালা
তোমারে দিল না যাঁরা, তারা সব কৃমির উপমা,
দূরতম তারা, আমি এই ক্ষুদ্র গ্রহের নিরালা
চাহি না, চাহি না, দিয়ো অনন্ত রাত্রির প্রিয় অমা।

যে বঙ্গে আমার জন্ম নরদেহে, প্রজাপতি জানে
সেখানে নিহত প্রিয় প্রণয়ের নষ্ট বাসনায়
পল্লবে নীহার জমে, কণ্টকের বিস্ফার উদ্যানে—
তবু প্রায়শই শব্দ-মিলে কবি কবিতা বানায়,

মাঝে মাঝে পর্ণ ঝরে, গুলমোরের স্তবকে, নিভৃত ;
দু'একজন বন্ধু স্মৃতি, কিছু শব্দ প্রিয়, বাকি মৃত।

আলোক সরকার

হারানো আপন দিন

মেঝের জমানো ধূলো হাওয়া এসে নিয়ে যায় দূরে
সোনা চিকচিক করে সকালের প্রথম রোদ্দুর।
এর চেয়ে দীপ্ত আরো সন্নিহিত মনোহর সুর
অসীম আকাশে ব্যাপ্ত। তুমি একা বিলাসী নূপুরে।

বিছানা নরম তাতে শুয়ে থেকে অসহ্য যন্ত্রণা
যা পাও অধিক বড়ো বেদনার অন্য তীর্থে যাবে ?
গাছগুলো নত মুখ— সব ধূলো নিমেষে ফুরাবে
এই তো শান্তির লগ্ন পূর্ণ হোক মুহূর্তের কণা।

সব-ই তো ব্যর্থতা, দুঃখ, তীব্র জ্বালা অথবা আপাত
শোভন পোষাক পরে সৌজন্যের হাসির উত্তাপ।
যদি যাও খরস্রোতে আকাঙ্ক্ষার হীন অপলাপ
আনতে কি পারবে আলো ? হয়তো বা অন্য উপজাত

হারানো আপন দিন। তাকে খুঁজি, স্নিগ্ধ গন্ধবহ।
শুয়ে থাকতে কষ্ট হয়, ঘুমোনো তা আরো দুর্বিষহ !

আনন্দ বাগচী

পতঙ্গের ভাষ্য

দর্পণে দুয়ার নেই, শুধু যাদুঘর,
বিভ্রান্ত ভ্রমণে জানি অন্তিম প্রহার,
প্রদীপ শিখরে আলো, নিচে অন্ধকার
মৃত্যুর চুম্বনে তবু কেঁদেছে অধর।
কার কণ্ঠস্বর শুনি, কার কণ্ঠ-শর
অন্ধ বেগে ছুটে আসি তাই বারবার,
স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাবো অঙ্গের অঙ্গার
আমার প্রেমের তীর্থ আমার কবর।

স্বভাবে পতঙ্গ আমি বুকে বড় জ্বালা
দেখেছি কাজললতা প্রদীপের নীচে
এবার জীবন জুড়ে জুড়াবে যৌবন।
রমণীর রূপ শিখা, হৃদয় নিরালা,
আগে রূপে দগ্ধ হই মুগ্ধ হই পিছে,
প্রেমের নেপথ্যে থাকে জনম হনন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এই শতাব্দীর দ্বিধা

আনন্দে সৌভাগ্যে গর্বে দুঃখে যারা হাঁটে
পরস্পর মুখ দেখে দৃষ্টি চিনে নিতে
কাপুরুষতার বীজ প্রতি ধমনীতে
স্পন্দ্যমান, আমি জানি প্রত্যেক ললাটে

ক্ষুদ্র চিহ্ন, ইঁদুরেরা তীক্ষ্ণ দাঁতে কাটে
তাঁবুর কানাত, দড়ি, অসহায় শীতে
আচ্ছাদন হীন, কার অমোঘ ইঙ্গিতে
যেন সকলেই কাঁপে দীর্ঘ খোলা মাঠে।

আকাশ পুরানো নীল, দীপ্ত রৌদ্রালোক
চিরকাল এক আছে, শুধু এ জীবন
প্রতি শতাব্দীর হাতে করে সমর্পণ
খণ্ড খণ্ড স্মৃতিমালা, পরিশুদ্ধ শোক।

আমার মৃত্যুর পর সন্দেহ, জানিনা
মানব সঙ্ঘের আত্মা, আর বাঁচবে কিনা।

সংযোজন

প্রিয়নাথ সেন

অব্যক্ত বাসনা

সাধ যায় বালা—আঃ রে দুরন্ত সরম্ !
এমন ক'দিন আর মরি জ্বলে জ্বলে ?
দূরে যা রে লজ্জা ভয়— দূরে যা সম্ভ্রম !
প্রাণের গোপন ব্যথা দিই তবে বলে।

'সাধ যায় অয়ি বালা, তুমি যে দরদী
মোর দুঃখে'···কি বলিরে, রুষিবে দেবতা !
না— না পোড়া আশা নিয়ে যতই দগধি
মনে মনে,—মনে থাকে মনের যা কথা।

কিন্তু কেন মর্মে রাখি এ আগুন জ্বেলে,—
যা হয় তা হোক, তাহে দিই জল ঢেলে।

বলি আমি— তার পরে খেদ নাই কোনো।
'সাধ যায়'···বুক ফাটে, মুখ নাহি ফুটে,
বলিব— বলিরে তবু— প্রাণ কণ্ঠে উঠে !
সাধ যায়—ওগো তুমি শোনো, তুমি শোনো

হেমেন্দ্রলাল রায়

আলিঙ্গন

তুমি জড়ায়েছ মোরে দু'টি বাহু দিয়া,—
সবল সুন্দর দু'টি পুষ্প বাহু-পাশ,
নিখিলের লীলায়িত তরঙ্গিত হিয়া,
সে বন্ধনে শিহরিয়া ফেলিছে নিশ্বাস।

বুকে বুক মিশে গেছে— ঘন আলিঙ্গন,
কুসুম শিখর দু'টি নোয়ায়েছে শির,
অধরে অধরে জাগে অজস্র চুম্বন,
অগুণ্ঠিতা ভাষা-বধূ বাহিরে বাহির।

মদনের মহোৎসব মনের আগারে,
আবির কুঙ্কুম-পঙ্কে ধরা লালে লাল,
দু'টি আত্মা মিলিয়াছে দেহের দুয়ারে,
এক হ'য়ে মিশে গেছে আজ আর কাল।

লুপ্ত দেশ-কাল-পাত্র—শুধু চিরন্তন,
আছে বুকে বুক এক নগ্ন আলিঙ্গন।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ব্যবধান

তুমি আকাশের পাখী অবন্ধনা ডানায় উড্ডীন,
আমি সাগরের মীন ডুবি ভাসি সুনীল সলিলে।
না জানি কি সৌরক্ষণে দূর হতে আমারে দেখিলে,
গুটায়ে তোমার পাখা সিকতায় হলে সমাসীন।

ফেনিল উদ্বেলভরা তরঙ্গের ক্ষিপ্র আলোড়নে
ভাসিয়া উঠিনু আমি আছাড়ি পড়িনু তব তটে,
চাহিয়া রহিলে তুমি মোর পানে নিস্পন্দ নয়নে
দুরু দুরু বক্ষে আমি কাঁপি শুধু তোমার নিকটে।

এলে তুমি কাছে মোর বঙ্কিম গ্রীবাটি নত করি,
আমার অধর 'পরে রাখিলে তোমার চঞ্চুপুট,
জানি না তোমার ভাষা, শুনি শুধু মঞ্জুল অস্ফুট
মধু কণ্ঠধ্বনি তব, সে মর্মরে উঠিনু শিহরি।

অচিরে আসিল ঢেউ আমারে ঘেরিল কলোচ্ছ্বাসে,
শুভ্রপক্ষ দুটি মেলি নতনেত্রে উড়িলে আকাশে।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

সন্ধ্যালোকে

দিনের আলোক-তরী যবে চ'লে যায়
দিকচক্রবাল-পারে, তোমাদের চোখে
বুঝি আসি' বাসা বাঁধে কৃষ্ণ কুয়াশায়,
একটি সমাপ্তি হেরো শুধু বিশ্ব-লোকে।

আরেক জগৎ কোন্ মহা মহিমায়
জ্যোতির স্পন্দনে ধীরে ধীরে ওঠে জাগি'
আমার আঁখির আগে, নক্ষত্র-সীমায়
যাহার বারতা ছোটে গীত-অনুরাগী।

মর্ত্ত্যের এ চক্ষু দুটী যবে যায় মুদি'
এ-কোন্ জগতে জাগে অমর্ত্য আলোক,
এ-হিয়া ধরার পানে যবে দেই রুধি'
আরেক জগতে জাগি পূর্ণ ও অশোক,

অন্তর-নয়ন মোর সন্ধ্যা যাদুকরী
আরেক আরম্ভ দিয়া তোলে দীপ্ত করি'।

ক্ষিতীশচন্দ্র সেন

সনেট

দৈন্যমাঝে দুঃখমাঝে সংকীর্ণতামাঝে
অন্তর-অতলে কে গো ক্রন্দে মুক্তি তরে ?
বন্ধন কারায় আত্মা লুঠে শ্রান্তিভরে,
মুমূর্ষু স্বপন তার ক্ষুব্ধাকাশে বাজে।
কোথা স্বাধীনতা, কোথা সম্পূর্ণতা রাজে ?
জিজ্ঞাসে মানব ক্লান্ত আগ্রহের স্বরে
কোনোদিন শ্রমকৃচ্ছ্রসাধনার পরে
পূর্ণতা আসিবে ফুল্ল সার্থকতা সাজে !

সেদিন মানব সত্য লভিবে কি শান্তি ?
অনির্বাণ মহানন্দে হবে জ্যোতিষ্মান ?
হয়ত সেদিন এক নবতর ক্লান্তি
নামি ভারাক্রান্ত তার করিবে পরাণ !
পূর্ণতা সেদিন তার মনে হবে ভ্রান্তি,
মাগিবে নিয়তি-হস্তে অপূর্ণতা দান ?

বিভুপ্রসাদ বসু

পাহাড়

প্রাচীন পাহাড় রহে শূন্যেরে আঁকড়ি',
দিগন্তে নিলীন যেন ধূসর জড়তা ;
সৃষ্টির জটিল গতি— মূক মুখরতা
পাষাণ-পঞ্জরে রহে মূর্ছাহত পড়ি'।
পাহাড়-গহ্বর ভেদি' সুচির শর্বরী
কঙ্কাল-কর্কশ বুকে চাপে জীর্ণ ব্যথা,
নিরুদ্দেশ অস্তিত্বের নিবিড় জনতা
কন্দর-আশ্রয়ে ফিরে নিঃশব্দে সঞ্চরি' :

গুহাশ্রিত অন্ধকার— দুর্বোধ জীবন
বন্ধ বিবরের এক মোহ সর্বনাশা,
সৃজনের তরঙ্গিত আদিম জিজ্ঞাসা
প্রস্তর-সমাধি লভে কঠিন মরণ।
তিমির সিন্ধুর কূলে নির্দয় ভাঙন
ফেলে যায় পঙ্গু প্রেম— নিরুত্তাপ আশা

কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

উত্তরণী

কোথা উত্তরণ-তীর্থ— কতো দূরে শেষ ঘূর্ণিপথ !
মাথা তোলে অসন্তোষ, নাচে রক্তে আবর্ত-আবেগ,
নির্জীব প্রাণের প্রান্তে মাথা কুটে প্রকাণ্ড শপথ—
সুদূর মনের কোণে বিপ্লবের ঘনকালো মেঘ।
স্বপ্নরাঙা প্রভাতের রাশি রাশি আলোকের ভিড়
গুমরায় চিড়হীন আঁধারের প্রান্ত সীমানায়,
স্বাদহীন বর্ণহীন জীবনের আশ্বাস নিবিড়
রুদ্ধ দ্বারে বারে বারে করাঘাত হেনে চলে যায়।

আলোর দিশারি কই, নব যুগ-জন্মে উত্তরণ,
শুচিশুভ্র জীবনের মুখোমুখি মুগ্ধ পরিচয় !
পুরাতন ধরণীর মৃত্যুনীল গাঢ় আবরণ
দুই হাতে ছিঁড়ে ফেলে হোক নবীনের অভ্যুদয়।
দিনে দিনে সয়ে-যাওয়া জীবনের গ্লানি আমরণ
পুড়ে হোক সোনা, যাক মুছে ভীরু শঙ্কিত সংশয়।

নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একদা

একদিন এসেছিলে নিকটে আমার,
সেদিন দোঁহায় যেন স্বপন্‌-আবেশে
এক হয়ে মিশেছিনু ; কত কেঁদে হেসে
কেটেছিল কতদিন ; কত বেদনার

রসঘন অনুভূতি, কত যন্ত্রণার
কেমন সহজে ভাগ কত ভালোবেসে
নিয়েছিনু দুজনায়। আজ অবশেষে
দলিত কুসুম মাত্র জাগে স্মৃতি তার।

হেমন্তের হিমে হেথা ভরেছে বাতাস,
ঝরো ঝরো শতদলে শিশির শিহরে ;
দিকে দিকে জাগিতেছে বেদনা-আভাস
ধূমল আকাশে আর পত্র-মরমরে।

এই পূর্ণ পরিব্যাপ্ত অবসাদ-মাঝে
জানি না ফিরিছ তুমি কোথা কোন্ সাজে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অন্বেষণ

তোমাকে দেখেছি আমি, হে প্রিয় সুহৃৎ, রাত্রিদিন
কী আনন্দে মগ্ন থাকো, কী প্রগাঢ় নিবিড় বিশ্বাসে
বঞ্চিত বুদ্ধির জ্বালা ক্রমশ প্রশান্ত হয়ে আসে
সমাহিত সান্ত্বনায়, কী পরম প্রার্থনায় লীন
জিজ্ঞাসার মতন যন্ত্রণা ; শুভ্রতার অন্তহীন
অপরূপ রৌদ্রময় উন্মোচিত উদার আকাশে
স্বপ্নের মুহূর্তে মূর্ত স্থিরজ্যোতি নক্ষত্রের পাশে
তোমার বিহঙ্গ-মন আনন্দের পাখায় উড্ডীন।

এখানে বিক্ষত আমি, সারাক্ষণ প্রশ্নের পাথরে
মাথা খুঁড়ি ; শান্তিহীন বুদ্ধির আগুনে দুই পাখা
পুড়িয়ে সর্বস্বরিক্ত। তবু শোনো, যে-উত্তর আঁকা
তোর সহাস্যশুভ্র শান্ত মনে, আমিও কান্নার
প্রহরে তাকেই খুঁজি, খুঁজি তাকে বিক্ষোভের ঝড়ে,
আমারো এ রক্তঝরা জিজ্ঞাসায় অন্বেষণ তার।

সিদ্ধেশ্বর সেন

এই প্রাণময় গ্রহে

এই প্রাণময় গ্রহে প্রতিদিন সূর্যাস্ত-সন্ধ্যায়
রাত্রিশেষে প্রতিদিন সূর্যোদয়ে ফিরেছি আবার
অবিচ্ছিন্ন মানবতা, সেই এক কর্মে ও প্রজ্ঞায়
দেখেছি ভাস্বর-রূপ, ভালোবাসা, সব হারাবার

সমস্ত পাবার সাধ একাকার সঙ্গীতের মত :
গর্জনের মত নয়, যেমন সে বিকিনিতে ওঠে
দুরন্ত প্রবালে নাকি মৃত্যুপুঞ্জে বিনাশে আতত
সমুদ্র আছড়ায় দেহ হাওয়া ঘোর ঘূর্ণী হ'য়ে ছোটে,

আমাদের জীবন কি জাপানী দরিয়া, জেলে ডিঙি
যার ভবিতব্যে ভাসে, প্রলয়-রশ্মিতে যায় পুড়ে
না কি সে অমোঘ, ভাঙবে প্রচণ্ড দম্ভের বিকিকিনি
অনু কি উদ্‌যানে বাঁধবে ধ্বংস নয় সৃষ্টিই নূপুরে

এই প্রাণময় গ্রহে, নৃত্যপর ঘূরণে, আহ্নিকে :
মুক্তি চায় মানবতা অবিচ্ছিন্ন সময়ের দিকে ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

চিহ্ন

সারাটা পৃথিবী তুমি রেখে গেছো স্মৃতিচিহ্ন ক'রে ;
আমি ভয়ে-ভয়ে থাকি, যদি কেউ ক'রে নেয় চুরি
রাত্রিদিন জেগে থাকি, দিতে যদি একটি অঙ্গুরী
যেকোনো আঙুলে বেঁধে ঘুমোতাম আমি রাত্রি ভ'রে,

কাকচক্ষু তার জলে, তার শীর্ণ হীরার অক্ষরে
তুমি শুধু জেগে রইতে, তুমি আর তোমার মাধুরী
জেগে-জেগে কোনোদিন ফুরিয়ে যেতে না, ঘুমঘোরে
আমি সে-নদীর তীরে যেন এক মৌন রাজপুরী ।

এখন পাহারা দিয়ে দেখি আমি প্রতি মাসে-মাসে
বিগত মাঘের মতো ভ্রমর বিশ্বাসী আছে কিনা,
এখন পাহারা দিই দূর থেকে, ভিতরে যাই না,
এ-সংহত হ্রদে সেই পদ্মের শিশুর ছায়া ভাসে,

এ-বিস্তৃত নীলিমায় সেই চন্দনার শিশু ওড়ে,
সমস্ত পৃথিবী তুমি রেখে গেছো স্মৃতিচিহ্ন ক'রে ॥